আশ্চর্য!

মরুভূমিতেও
চাঞ্চল্য
জাগিয়েছে !...

নতুন
ধারাবাহিক
উপন্যাস

জুলাই—আগষ্ট ১৯৬৭ দেড় টাকা

ডক্টর নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এ মাস থেকে লিখছেন...

আগন্তুক

এছাড়া

টাইম
মেশিনে
ষাট লক্ষ বছর

প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার
রোমাঞ্চকর
রহস্যজনক
নভেলেট

Bengali Download

eBook Releaser Group Presents

Next Generation eBooks with No Watermark

We always encourage to buy original books

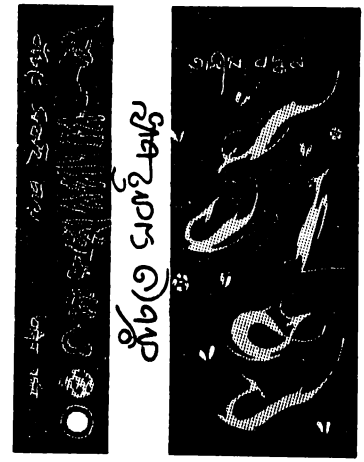

বাঁচতে সবাই চায়

অসীম বর্দ্ধন

জীবনের সার্থক পরিতৃপ্তি লাভের একান্ত ঘরোয়া আলোচনা

●

হিংসার তীব্র বিষও সঞ্জীবনী সুধা হয়ে ওঠে, ভুলে যাওয়াটা মনে রাখারই কারসাজি মাত্র, ভয়ের হিম-শীতল স্পর্শই জীবন সংগ্রামের প্রেরণা জাগায়—এমনি বহু চমকপ্রদ মূল্যবান তথ্য অনন্য ভঙ্গিতে পরিবেশিত। কেমন করে এতটুকু স্নেহ ভালবাসা, রসিকতার সাধনা আর কমনসেন্স শীতের মিষ্টি রোদের মতো জীবনের উষ্ণ তৃপ্তি এনে দেয়। আর আছে প্রশান্ত নিদ্রা উপভোগ করে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল মন নিয়ে প্রভাতে জেগে ওঠার পথসঙ্কেত আর স্বপ্নের রহস্য ভেদের ঘরোয়া উপায়।

"অনেক চমকপ্রদ তথ্য, মনোরম"—আনন্দবাজার পত্রিকা

"বিচিত্র তথ্য, উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণ···বাংলা সাহিত্যে সুলভ নয়"—যুগান্তর

"গল্প ছেড়ে পড়তে ইচ্ছে করে···বিচিত্র···আকর্ষণীয়"—বসুমতী

"উল্লেখযোগ্য বই"—দেশ

"মূল্যবান, চিত্তাকর্ষক···বাংলা ভাষায় দেখা যায় না···উচ্চাঙ্গের"—অমৃত

"বাঁচতে যাঁরা চান, তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন"—ভারতবর্ষ

"একখানি অবশ্যপাঠ্য বই"—সমকালীন

"আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণার উৎস"—মানসী

সাধারণ মানুষ পুস্তকটি পড়ে সুখশান্তির সন্ধান পাবেন, সন্দেহ নেই"—কথাসাহিত্য

দ্বিতীয় সংস্করণ, প্লাষ্টিক ভার্নিশ করা আর্ট জ্যাকেটে মোড়া—

দাম টা ৩·৭৫ (ডাকব্যয় ৮১ প.)

অ্যাল্‌ফা-বিটা, ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলকাতা ১৪

একটি অভিনব মাসিক পত্রিকা

আশ্চর্য!

জুলাই-অগাস্ট ১৯৬৭

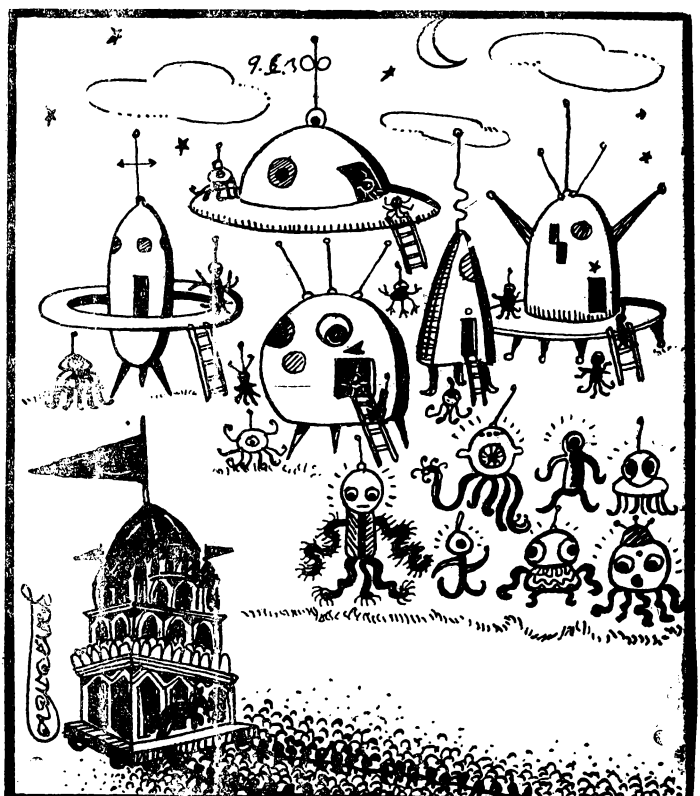

যেদিন নানা গ্রহবাসী রথের মেলায় আসবেন…

[কার্টুন : কুমার অজিত]

সম্পাদক : আকাশ সেন * প্রকাশক : অসীম বর্ধন

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪ ; ফোন : ৩৪-৭২৭৪

এই সংখ্যার দাম টা ১·৫০ ; বার্ষিক চাঁদা ১৮৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৯৲ টাকা

প্রধান উপদেষ্টা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রধান পৃষ্ঠপোষক : সত্যজিৎ রায়

আশ্চর্য !

জুলাই-অগাস্ট ১৯৬৭
৫ম বর্ষ : ৭ম-৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

ধারাবাহিক ৮ আগন্তুক—ডক্টর নীহার রঞ্জন গুপ্ত
উপন্যাস সুরু হলো রহস্যের যাদুকর লেখকের অভিনব বিজ্ঞানসুবাসিত উপন্যাস

উপন্যাসিকা ১৭ টাইম মেশিনে ষাট লক্ষ বছর : ডক্টর শ্রীধর সেনাপতি
সময়ের চোরাবালিতে দুটি মানুষ ডুবে গেল···বিশ্বাস হয় !

গল্প ৬৪ সেই আশ্চর্য পা—অর্ণব সেন
এমন খেলা নাকি কলকাতার মাঠে গত কয়েক বছর দেখা যায়নি
৭৩ মানুষ গড়া কল—নীহারেন্দু দাস
আবার ফাংকেনস্টাইন !
৮৯ কে ঝরলো ধান লিচু আম জাম তরমুজ!—উপেন মান্না
আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ টন ফল-শস্য বৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীতে···
১১৮ সে-বিয়ে তো অলৌকিক নয় !—বাসুদেব ভট্টাচার্য
দুটি প্রণয়োন্মুখ অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীর হাতে···

বিবিধ ১৩৮ নির্জলা বিজ্ঞান
বিচিত্র খবরাখবর

সিনেমা ১৪২ সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের টুকরো খবর

অনিবার্য কারণে জুলাই-অগাস্ট সংখ্যার 'আশ্চর্য !' একসঙ্গে প্রকাশিত হলো ; এর জন্য বর্তমান গ্রাহক-গ্রাহিকাদের চাঁদার মেয়াদ এক মাস বৃদ্ধি করা হলো।

আশ্চর্য!

পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়ম

১। 'আশ্চর্য!' বিজ্ঞানসুবাসিত কল্পনারঙীন গল্পকল্প কার্টুন তথ্যের মাসিক পত্রিকা। সুতরাং এতে সায়ান্স-ফিকশন, ফ্যানটাসি ধরনের গল্প, উপন্যাস, খবরাখবর, কার্টুন, নাটক ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। লেখক ও শিল্পীরা কেবলমাত্র সেই ধরনের জিনিসই পাঠাবেন। ছোট গল্পের প্রয়োজনই বেশি।

২। ছোট গল্প ৬০০০ শব্দ এবং উপন্যাস ২৪০০০ শব্দের মধ্যে (মোটামুটি) হওয়া চাই।

৩। প্রত্যেক লেখা ইত্যাদির সঙ্গে ঠিকানা-লেখা পোষ্টকার্ড থাকা চাই।

৪। বিদেশী ছায়া অবলম্বনে বা অনুবাদ করলে তার বিশদ উল্লেখ অবশ্যই করা দরকার।

৫। গল্প, ইত্যাদির নীচে লেখকের নাম ঠিকানা থাকা চাই।

৬। অবশ্যই নিজের কাছে লেখার একটি কপি রেখে পাঠাবেন। প্রকাশের জন্যে কপিটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা দরকার।

৭। প্রাপ্ত লেখা ইত্যাদি সযত্নে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার কোনো দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৮। মনোনীত হলেও লেখা ইত্যাদি প্রকাশ হতে যথেষ্ট দেরী হতে পারে; সেজন্য তাগিদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম ও সুযোগ

১। বার্ষিক চাঁদা ১৮৲ অগ্রিম মনিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার বা ক্রশ চেকে পাঠাবেন "Alpha-Beta Publications" নামে। কলকাতার বাইরের চেকে এক টাকা ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে।

২। ভিপিতে পত্রিকা না নেওয়াই ভালো—খরচ বেশি পড়ে, টাকা নিয়ে গোলমাল হয় পোষ্টাপিসে।

৩। রেজিষ্টার্ড ডাকে পত্রিকা নিতে হলে বছরে ৬'৬০ পয়সা বেশি লাগে। অফিস থেকে হাতে করে পত্রিকা নিতে হলে সেকথা আগে জানিয়ে দিতে হয় এবং প্রতি ইংরেজী মাসের ২০ তারিখ নাগাদ চাঁদার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয় বেলা ১টা থেকে ৫।। টার মধ্যে।

৪। ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে লিখিতভাবে P. M. G., W, B. Circle, Calcutta-1 ঠিকানায় অভিযোগ-পত্র পাঠিয়ে তার অনুলিপি পত্রিকা অফিসে পাঠাবেন। তাহলে আর এক কপি পত্রিকা দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

৫। গ্রাহক হলে বিশেষ জয়ন্তী সংখ্যা পূজা সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা প্রভৃতির জন্য বেশি দাম দিতে হয় না।

অস্বস্তিকর কাশি
নিরাময় করে **বাসক**

প্রাচীন কাল হইতে বাসকের কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক গুণ সুবিদিত। গোলমরিচ ও পিপুল সংযোগে এই গুণ বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। নিয়মিত সেবনে কাশি দমন হয় ও কফ তরল হইয়া সহজেই নির্গত হয়। শ্বাস কষ্টের লাঘব করিয়া শ্বাস যন্ত্রকে স্নিগ্ধ রাখে। বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষে সমান উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর

আশ্চর্য!—শারদীয়া সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের 'আশ্চর্য!' শারদীয়া সংখ্যারূপে

মহালয়ার আগেই বেরুবে

এতে থাকবে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপন্যাস, উপন্যাসিকা ও গল্প ইত্যাদি

আয়তনে, দামে সংখ্যাটি সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী হবে

কিন্তু গ্রাহকগ্রাহিকাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না

এই সংখ্যাটি ডাকে হারালে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়

সেইজন্য যাঁরা রেজিষ্টার্ড ডাকে নিরাপদে ঐ সংখ্যাটি পেতে চান

তাঁরা ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৬০ পয়সা বা ঐ দামের ডাক টিকিট পাঠাবেন

হাতে নিতে হলে ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অফিসে চিঠি দিয়ে রাখবেন

এখুনি গ্রাহক হয়ে পড়ুন

'আশ্চর্য!', অ্যালফা-বিটা, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

বিশ্ববিখ্যাত রঙীন ফিল্‌ম্‌

ওয়ার অভ দি ওয়ার্লড্‌স্‌

আগামী ১৫ই অগাস্ট লাইট হাউস সিনেমায়

দেখবেন এস্‌ এফ সিনে ক্লাবের সদস্যরা।

তারই সচিত্র বাংলা পকেট বই

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ

এখনি পড়ে রাখুন

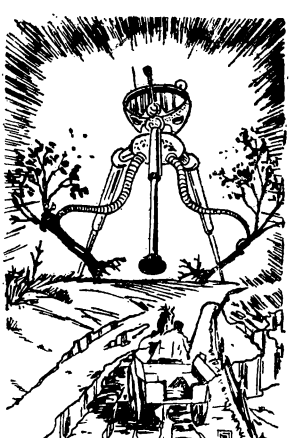

দাম মাত্র ৮০ পয়সা

[এস্‌ এফ সিনে ক্লাবের সদস্যদের জন্য মাত্র ৩০ পয়সা]

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, ৯০-১, সারপেনটাইন লেন, কলি ১৪

বাংলায় প্রথম !

বিজ্ঞানসুবাসিত কল্পনারঙীন উপন্যাস নাটক গ্রন্থমালা

নতুন নতুন বই বেরুচ্ছে !

অল্প দাম ! উপহার দিন !

ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেণ্ট (জুল্‌স্ ভর্ন)—অদ্রীশ বর্ধন ২৲

রামধনু-রঙ মাণিক—আদিত্য ভট্টাচার্য ২৲

মরণ ঘুম—অজয় হোম ১·৭৫

চারশো পঞ্চান্ন দিন পরে— মতি মুখোপাধ্যায় ১·৭৫

অগ্নির দেবতা হেফেসটাস—ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী ১·৭৫

যমালয়ে ১৯৯৭ (নাটক)—নকুল মুখোপাধ্যায় ১·৭৫

কুমেরুর বিভীষিকা—রণেন ঘোষ ২৲

আরও অনেক রকেট বই আছে, আরও বেরুচ্ছে !

নতুন ধরনের উপন্যাস গল্প নাটক !

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা ১৪

অমাবস্যার রাত···আকাশে ভাসছে আলোর বৃত্ত···সাঁ করে নেমে এলো একটা আলোর স্ফুলিঙ্গ···রাজস্থানের মরুভূমিতে দেখা গেল গড়াচ্ছে একটা অদ্ভুত লোহার বল···

ডক্টর নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রহস্য-রোমাঞ্চ-লোমহর্ষক
কাহিনীর জাদুকর

এবার শুরু করলেন
এক অভিনব
বিজ্ঞানসুবাসিত উপন্যাস…

॥ ১ ॥

গত চার পাঁচ মাস সংবাদপত্রে ছোট একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—স্থানীয় নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদ।

অমন ত কতই বের হয় কিন্তু কজনারই বা তেমন করে নজরে পড়ে বা সে সংবাদ আগ্রহ করে পাঠ করে? বিশ্বাসও করে না হয়ত—

সংবাদটাও এমন কিছু না—বিশেষ করে আজকের দিনে যখন রকেটে চেপে বিজ্ঞানীরা এত কালের স্বপ্নের আকাশের চাঁদের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে—তার ছবি তুলে—আনছে তার নাড়ি নক্ষত্রর খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করে আনছে।

সংবাদটা ছোট—সংক্ষিপ্ত।

উল্কাপাত ঘটেছে।

বাংলা দেশেরই এখানে ওখানে—

গত চার পাঁচ মাসের মধ্যে চার পাঁচ বার উল্কাপাত ঘটেছে।

মধ্য রাত্রে—বিশেষ করে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে অকস্মাৎ কালো আকাশের বুকে আলোর একটা বৃত্ত যেন শূন্যে ভাসতে ভাসতে এক সময় ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে মিলিয়ে গিয়েছে।

যারা দেখেছে ব্যাপারটা তাদের ধারণা ওটা একটা উল্কাপাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং যা কত সময়ই ত ঘটে থাকে—আর ঘটছেও।

তাই ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বা চিন্তা করবার মত কিছুই নয়।

কিন্তু আর কারো দৃষ্টিতে না পড়লেও এবং চিন্তার কোন খোরাক না জোগালেও বাংলা দেশের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এবং তিনি ব্যাপারটা স্রেফ একটা উল্কাপাত বলে যেন মেনে নিতে পারেন নি।

অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু—ডি, এস, সি।

বয়স খুব বেশী নয় অধ্যাপকের—

চল্লিশের মধ্যে,

রোগা ডিগ্‌ ডিগে লম্বা চেহারা।

এক মাথা ঝাঁকরা ঝাঁকরা রুক্ষ চুল। চুল ত নয়, যেন কাগের বাসা। আড়ালে ছাত্ররা তাই বলাবলি করত কাগতাড়ুয়া পণ্ডিত—বড় বড় দুটো চোখ—কেমন যেন তাতে অন্যমনস্ক ভাসা ভাসা দৃষ্টি পুরু চশমার লেন্সের ওধার থেকে দেখা যায়।

বিয়ে থা করেন নি—

একা মানুষ।

মামা ছিল মস্ত বড় লোক—নামকরা এক ব্যারিষ্টার।

প্রথম যৌবনে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়ে এক মেম সাহেবকে বিয়ে করে এনেছিলেন ভদ্রলোক—কিন্তু পাঁচটা বছরও গেল না—

মেমসাহেব আবার বিলেতে পাড়ি জমালেন,

মামা আর বিয়ে করেন নি।

ঐ সময়ই শঙ্করী প্রসাদ গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়বার জন্য কলকাতায় এসে মামার আশ্রয়ে উঠলেন।

তারপর থেকে মামার আশ্রয়েই থেকে গিয়েছেন।

মা বাপ শঙ্করী প্রসাদের আগেই মারা গিয়েছিল—তিনি তার দূর সম্পর্কীয় এক জ্যাঠার কাছে গ্রামে ছিলেন।

শঙ্করী প্রসাদ কলকাতায় চলে আসবার পর সেই জ্যাঠাও তার আর কোন খোঁজখবর নেন নি—শঙ্করী প্রসাদও নেন নি।

বালীগঞ্জে মামা বিরাট এক বাড়ি করেছিলেন—

মরবার পর দেখা গেল, মামা ঐ বাড়ি ও সব কিছু তার একমাত্র ভাগ্নে শঙ্করী প্রসাদকেই দিয়ে গিয়েছেন।

সব কিছুর মধ্যে ব্যাংকের একটা মোটা টাকাও ছিল।

শঙ্করী প্রসাদ তখন এম, এস, সির ছাত্র—ফিজিকস্‌য়ে।

তারপরে ক্রমে শঙ্করী প্রসাদ ডি, এস্ সি হলেন।

শঙ্করী প্রসাদের যে এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছিল বিলেতে গেলে আরো স্বীকৃতি পেতেন হয়ত, কিন্তু সে পথেই গেলেন না তিনি।

এমন কি কোন সরকারী কলেজে কোন চাকরি পর্যন্ত নিলেন না, চেষ্টাও করলেন না। অতি সাধারণ একটা বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিলেন।

আর মামার বাড়িটার তিন তলার ওপর নতুন করে চার তলা তুলে বিরাট এক হল ঘর করে সেখানে একটা গবেষণাগার গড়ে তুললেন।

বিচিত্র বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি—

এবং বিশেষ করে তার মধ্যে যেটা ঘরের মধ্যে ঢুকলেই নজরে পড়ে—ঘরের ঠিক পূব কোণে—সেখানে ছাতটা খানিকটা ফাঁক।

সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উঠে গিয়েছে বিরাট একটা টেলিস্কোপের মাথাটা—সোজা আকাশের দিকে।

মস্ত একটা উঁচু প্ল্যাটফরমের ওপরে বসানো সেই বিরাট টেলিস্কোপটা।

রাত্রে যখন পৃথিবীর সবাই ঘুমায় অঘোরে পরম নিশ্চিন্তে যে যার শয্যায় শুয়ে; সেই সময় শঙ্করী প্রসাদ ঐ টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে নিঃসীম অন্ধকার আকাশের বুকে নিদ্রাহীন চোখে কি যে খোঁজেন তা তিনিই জানেন।

ক্লান্তও হন না একটু।

রাত্রির পর রাত্রি একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

লোকজনের মধ্যে আর একটি বাড়িতে ছিল—জেমিনী।

একবার কি কাজে শঙ্করী প্রসাদকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হয়েছিল, সেই সময় জেমিনীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

জেমিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কলকাতায়।

কালো কুচকুচে গায়ের রং।

বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ গঠন।

সাধারণ দক্ষিণ ভারতীয়দের মত নয়—বোঝা যায় গায়ে বেশ শক্তি রাখে জেমিনী।

তামিল ভাষা ছাড়া ভাংগা ভাংগা ইংরাজীতে কথা বলতে পারে লোকটা।

সর্বকাজে একেবারে যাকে বলে বিশারদ।

রান্না থেকে শুরু করে গৃহের যাবতীয় কাজ ত করেই—শঙ্করী প্রসাদের গাড়িও ড্রাইভ করে, এবং ইদানীং গবেষণাগারের কজেও শঙ্করী প্রসাদকে সাহায্য করে জেমিনী।

যন্ত্রপাতি সে মোটামুটি চিনে নিয়েছে—

আর একটা ব্যাপারে জেমিনী পারদর্শী ছিল—সেটা হচ্ছে বন্দুকের হাতটি তার—রাইফেল বা রিভলভার চালাতে সে একেবারে যেন দ্বিতীয় সব্যসাচী।

অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য তার।

শঙ্করী প্রসাদ শুধিয়েছিলেন, ঐ বিদ্যাটা তুই কি করে আয়ত্ত করলি জেমিনী—

জেমিনী তার ঝক্‌ঝকে মুক্তোর পাটীর মত একসার দাঁত বের করে মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল—

I was in military Sir—

Military-তে ছিলি—

Yes Sir—

তা চাকরি ছেড়ে দিলি কেন ?

Invalid হয়ে গিয়েছিলাম যে—

সে আবার কি ? invalid হয়ে গেলি মানে কি ?

হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে একটা এ্যাপিলেপটিক মত হতো আমার তখন—মাস পাঁচ ছয় তখন এসেছে জেমিনী শঙ্করী প্রসাদের কাছে।

কিন্তু কখনো সে রকম কিছু তিনি দেখেন নি জেমিনীর। তাই বললেন, কখনো ত দেখিনি···

দেখবেন কি করে···

কেন ?

আমার ত এ্যাপিলেপটিক ফিট্ নেই—মিলিটারীর জীবন আমার ভাল লাগছিল না—ছেড়ে দেবো ভাবছিলাম—কিন্তু ছাড়া পাওয়া তো অত সহজ নয়। তখন আমার এক ডাঃ বন্ধুর পরামর্শে আমি—

বুঝেছি—

শঙ্করীপ্রসাদ আর কিছু বলেন নি।

সেদিন মধ্যরাত্রে—

২রা জুন—

প্রচণ্ড গরম পড়েছে সেদিন কলকাতা শহরে, মধ্যরাত্রেও যেন

বাতাসে আগুনের হলকা—গবেষণাগারে টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে ছিলেন ছোট একটা টুলের ওপর শঙ্করীপ্রসাদ।

সহসা দেখতে পেলেন—

সেই আলোর বৃত্ত।

তারা ভরা নিঃসীম অন্ধকার আকাশের পথ বেয়ে যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা আলোর বৃত্ত নেমে আসছে—

আসছে!

মধ্যখানটা উজ্জ্বল—তার চারপাশে একটা জ্যোতির বলয় যেন।

নামতে নামতে বৃত্তটা যেন একবার থামল—

মুহূর্তের জন্য যেন থামল—তারপর আবার নামতে লাগল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই দিকে চেয়ে বসে থাকেন শঙ্করীপ্রসাদ।

নেমে আসলো—অনেকটা নেমে এসে হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়াল যেন আলোর বৃত্তটা—তারপরই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

সেই আলোর বৃত্ত থেকে একটা ছোট আলোর স্ফুলিঙ্গ মত যেন সোঁ করে নীচের দিকে ছুটে গেল—আর সেই আলোর বৃত্তটা পরক্ষণেই ওপরের দিকে আবার উঠে গেল—এবং দেখতে দেখতে তারার রাজ্যে হারিয়ে গেল।

৪ঠা জুনের সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো।

রাজস্থানে—

যোধপুরের একেবারে সীমানায়—মরুভূমির প্রান্তে যশোলমীরের মরুভূমির প্রান্তে বিচিত্র একটা লোহার বল পাওয়া গিয়াছে।

বলটা প্রথমে একটা উটচালকের চোখে পড়ে।

আকারে বেশ বড় লোহার বলটা—

দেড় ফুট ব্যাস হবে—

চক্ চক্ করছে—সূর্যের আলোয় এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে

ভারী একটা লোহার বল। বলটা দেখে উটচালক প্রথমে ভেবেছিল বোমা টোমা হবে বুঝি একটা—তাই সে পরীক্ষা করবার জন্য থেমেছিল—হঠাৎ সে দেখতে পেল—বলটা গড়াতে শুরু করেছে—ও একটু অবাক হয়েই যায়—

কোথায়ও কোন বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই—অথচ বলটা গড়িয়ে চলেছে ধীরে ধীরে—ঐ রকম একটা ভারী লোহার বল।

উটচালক ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে আসে এবং নিকটবর্তী গাঁয়ে এসে সকলকে কথাটা বলে।

তখন অনেকেই কৌতূহলের বশে ব্যাপারটা দেখতে যায়—

কিন্তু আশ্চর্য—সেখানে গিয়ে দেখে বলটা আর সেখানে নেই।

আশে পাশে কোথাও তার চিহ্নমাত্রও নেই—

সবাই হেসে ওঠে।

লোকটা বিব্রত বোধ করে।

কিন্তু উটচালক বলেছে—সে নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেছে—

যাহোক ঐ ব্যাপারের দুদিন পরে একজন মরুবাসী রাজপুত ঐ ঠিক একই রকমের একটা লোহার বলকে নাকি গড়িয়ে গড়িয়ে মরুভূমির বালুর মধ্যে দিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ায় বিস্মিত হয়ে—এবং শেষ পর্যন্ত সেও ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে স্থান ত্যাগ করে।

পরের দিন সকালে শঙ্করীপ্রসাদ জেমিনীকে ডাকলেন।

জেমিনী—

ইয়েস স্যার—

কালকের প্লেনে দুটো প্যাসেজ বুক কর—

কোথাকার—

জয়পুরের—

ওখানে ত বোধহয় direct flight নেই—

জানি, দিল্লী হয়ে যাবো—

জেমি নী ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই গবেষণাগারের দরজার গোড়ায় ডিং ডং বেলটা বেজে উঠলো—

ভ্রু কোঁচকালেন শঙ্করীপ্রসাদ—

ওপরে গবেষণাগারে কে এলো আবার ?

কারুর তো আসবার হুকুম নেই—

উঠে এগিয়ে গেলেন—

দরজা খুলতেই দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনী—

কি সংবাদ নন্দিনী—তুমি হঠাৎ এ সময়—

মেয়েটির বয়স ত্রিশের নীচে নয়।

কালো গায়ের রং।

ছোটখাটো পাতলা চেহারা।

পরণে সাধারণ একটি শাড়ি—গায়ে কোন অলঙ্কার নেই।

পায়ে সাধারণ একটি চপ্পল—

একটু দরকার ছিল স্যার—

এসো ভিতরে—

নন্দিনীর গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার ছিল—

শঙ্করীপ্রসাদের একজন অশেষ স্নেহের পাত্রী মেধাবী ছাত্রী ঐ নন্দিনী সেন।

নন্দিনী এসে গবেষণাগারে প্রবেশ করল।

কি খবর বল ?

গতকালকের সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেখেছেন—

কি বলত !

লোহার বল।

হ্যাঁ—

(ক্রমশঃ)

সময়ের চোরাবালিতে দুটি মানুষ ডুবে গেল···

একথা কারুর বিশ্বাস হয়!

টাইম মেশিনে ষাট লক্ষ বছর

শ্রীধর সেনাপতি

ছবি এঁকেছেন : রেণু প্রধান

বাঁকা ব্লেড্ দিয়ে বালুকা প্রস্তর কাটছিলাম।

সময় অপরাহ্ণ।

খাদের কিনারে এক দীর্ঘ ছায়া এসে পড়ল।

ব্লেড্ নামিয়ে রেখে মাথা তুললাম আমি। দেখলাম, খাদের অন্যপ্রান্তে একটি পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। তারই ছায়া লম্বা হয়ে এসে পড়েছে আমার কাছাকাছি।

'এই যে—' বলেই, ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়বার চেষ্টা করল সেই লোকটি।

আমি প্রায় আঁৎকে উঠলাম। তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে বললাম, 'থামো, থামো। সাবধান! সব কিছু নষ্ট করে ফেলবে নাকি তুমি? য়্যাঁ!'

ব্যাপারটা যেন বোঝবার চেষ্টা করল সে। ওপর থেকে ঝুঁকে সে আমার মুখের দিকে তাকাল। তার মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুলের গুচ্ছ লক্‌লকে সাপের মত পড়ল ঝুলে।

'ওগুলো ফসিল, তাই না?' সে বলল, 'পাথর হয়ে যাওয়া ফসিল, আমি দেখেছি। খুব শক্ত পাথর। কী বলছ তুমি—আমি নষ্ট করে দেব?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। এগুলো স্যাণ্ডষ্টোন। স্যাণ্ডষ্টোন খুব শক্ত হয় না। আর, এর ভেতরে যে হাড় রয়েছে, সেগুলো আরও নরম। তা ছাড়া হাড়গুলো অতি প্রাচীন কালের। মাটি খুঁড়ে ডাইনোসরে'র কঙ্কাল উদ্ধার করা আজ কাল অতি কঠিন কর্ম। বুঝলে?'

চিন্তিতভাবে সে তার নাকে হাত বুলোতে লাগল, 'হাড়গুলো কত দিনের পুরোনো বলে মনে কর তুমি?'

আমার হাতে পায়ে পোষাকে লেগে-থাকা ধুলো ঝেড়ে ফেলার দিকে এবার মনোনিবেশ করলাম আমি। লোকটির দিক থেকে হয়তো আরও প্রশ্ন আসবে। আমার মনে হল।

কিন্তু কে ও? কোন রিপোর্টার? কিংবা, এদিকে ওদিকে যে কয়েকটা ফার্ম নজরে পড়ে, তাদেরই মধ্যের কোন একটি থেকে ও হয়তো এসেছে।

'এখানে নেমে এসে আলাপ আলোচনাটা করলে ভাল হয় না?' আমি তাকে আহ্বান জানিয়ে বললাম, 'তবে, সাবধানে নামবে কিন্তু।'

তার খাদে নামার আগ্রহ অন্তর্হিত হয়েছে বোঝা গেল। কারণ,

লক্ষ্য করলাম, সে তার বুকের ওপরে দুখানা হাত আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করে সোজা হয়ে বসল।

পকেট থেকে সিগারেট বের করলাম আমি। একটা তার হাতে দিলাম।

'ধন্যবাদ।' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'তুমিই প্রফেসর বিশ্বরঞ্জন গুপ্ত? তাই না? মাটি খুঁড়ে ফসিল উদ্ধার করতে কী যন্ত্র ব্যবহার করছ তুমি?'

বাঁকা ব্লেড্ ওপর দিকে তুলে ধরে বললাম, 'এ জাতের হাড় বের করার জন্যে এটা একটা বিশেষ ধরনের ছুরি। মিউজিয়মের মডেল। যখন তোমার মত আমার বয়স ছিল, তখন আমরা কসাইয়ের ছুরি আর রেলরোড গাঁইতি ব্যবহার করতাম। এক কথায়, হাতের কাছে যা পাওয়া যেত, সেটাই ব্যবহার করা হত। রেল-রাস্তা তখন এখানে কোথায়?'

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমি জানি। আমার বাবাও সেইভাবে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করত। কিছুকাল ধরে ওটাই ছিল তার 'হবি'। ওই কাজ করতে করতে একটা পা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার। তখন তার 'হবি' হয়েছিল পুরনো ষ্ট্যাম্প জমানো।'

প্রসঙ্গের মোড় ঘুরে যাচ্ছে, সহসা বুঝতে পেরেই সে বলল, 'যাক সে কথা। যে জিনিষটা তুমি মাটি খুঁড়ে বার করছ, সেটা কী রকম দেখতে? মানে—সেটা যখন জীবিত ছিল—সেই অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

প্রায় অর্ধেক কঙ্কাল উদ্ধার করতে আমি সমর্থ হয়েছি। তাকে বোঝাবার জন্যে ছুরি দিয়ে প্রাণীটার একটা আনুমানিক নক্সা আমি এঁকে ফেললাম।

'এখানে মাথা। এই ঘাড়—মেরুদণ্ডটা এই পর্যন্ত; তারপর বাকী অংশটা ল্যাজ। সামনের দিকের বাঁ-পা এটা। মাথার কাছ থেকে মেরুদণ্ড বরাবর লক্ষ্য করে প্রাণীটার উচ্চতা তুমি অনুমান করে

নিতে পার। হাঁসের ঠোঁটের মত লম্বা চ্যাপ্টা নাক। ট্র্যাকোডন'দের একটি—অর্থাৎ হংসনাসা জলচর ডাইনোসর। জলজ তৃণগুল্ম আর গাছের পাতা ছিল এদের আহার।'

'আমি বুঝতে পেরেছি' সে বলল, 'পেছন দিকের তুলনায় সামনের পা দুখানা ছোট। ক্যাঙারুর মত বিরাট লম্বা ল্যাজ ছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেই ল্যাজের ওপরে বসে বিশ্রাম করত তারা। কপালের ওপরে মাছের মত পাখনাও ছিল। তাই না! আচ্ছা, জন্তুটার শরীরে কি আঁশ ছিল?'

'এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' আমি বললাম, 'কোন কোন জাতের ব্যাঙের গায়ে আঁচিলের মত যে জিনিষ দেখা যায়, এ প্রাণীর শরীরেও হয়তো ছিল তেমন জিনিষ। কিংবা কুমীরের মত শক্ত চামড়া ছিল তার শরীরের বর্ম বিশেষ। এই জাতের ডাইনোসরের চামড়া'র ছাপ, এখান থেকে কিছুটা দক্ষিণে আমরা দেখতে পেয়েছি। তার ফলেই আমার এই অনুমান।'

লোকটি ঘাড় নাড়তে লাগল। কেমন যেন একটা সবজান্তার ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। তার পোষাকের ভেতর থেকে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করল সে। কী যেন টেনে বার করল সেটার ভেতর থেকে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল একটু।

সাদা রঙের কী একটা জিনিষ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে।

'ওটার মত?' সে জিজ্ঞাসা করল।

জিনিষটাকে হাতে তুলে নিলাম।

একটা ফটোগ্রাফ! কোন ক্ষুদ্র ক্যামেরায় তোলা—বড় করা হয়েছে। নলঘাসে আচ্ছাদিত কোন হ্রদ বা নদীতীরের দৃশ্য। ফার্ন-জাতীয় গাছের সারি রয়েছে পশ্চাদ্‌পটে। একটা সঙ্কীর্ণ বালুময় ভূমিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমার পায়ের কাছে যে প্রাণীটির কঙ্কালের ছবি আমি ছুরি দিয়ে পাথরের বুকে এঁকেছিলাম, হাঁটু

ডোবা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জাতেরই এক প্রাণী···একটি ট্র্যাকোডন!

'বাঃ, সুন্দর নিখুঁত ছবি হয়েছে!' আমি স্বীকার করলাম, 'মিউজিয়মে নতুন এসেছে বুঝি?'

'মিউজিয়মে?' সে যেন ধাঁধায় পড়ল একটু, 'ও···মিউজিয়ম অব্ ন্যাচারাল হিষ্ট্রির কথা বলছ তুমি? আরে না, না। এটা নিজে পেয়েছি।'

'বেশ, বেশ। এর জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।' খুশী হয়ে আমি বললাম, 'এত ভাল মডেল আমি আর আগে দেখি নি। তা' এ ছবি···সিনেমার জন্যে নাকি?'

'সিনেমা?' তাকে কুপিত বলে মনে হল আমার, 'আমি সিনেমার লোক নয়, প্রফেসর। এ ছবি আঁকা নয়· ফটোগ্রাফ। আমি নিজে তুলেছি। আর, এইখানেই···এই জায়গাটার কাছাকাছি থেকে। প্রাণীটা জীবিত। আমাকে অনুসরণ করছিল।'

এবার কুপিত হবার পালা আমার। কী সব যা'তা' গাঁজাখুরি গল্প সুরু করেছে লোকটা? আমার কাজের বিঘ্ন ঘটাতে এসেছে কেবল! সময় নষ্ট হচ্ছে।

বেশ কড়াসুরে বললাম, 'তুমি বোধহয় কোন সংবাদপত্রের লোক। পাঠকদের চমৎকৃত করে দেবার চেষ্টায় আছো, তাই না? শোনো, বয়সে তোমার চেয়ে আমি বড়। আমার জীবনের অনেক গুলো বছর কেটে গেছে এই বিজ্ঞান সাধনাতে। আমি জানি, সংবাদপত্রের কোন ফটোগ্রাফারকে অনুসরণ করবার জন্যে কোন ট্যাকোডনের অস্তিত্ব এখন যেমন পৃথিবীতে নেই, তেমনি হ্রদ বা ফার্নের জঙ্গলও আর বিচরণক্ষেত্র হয়ে নেই তাদের। তুমি যদি কারো জন্যে ক্রেটেসাস যুগের জীবজন্তুদের মডেলের প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে চাও, তো বল। আমি আবার স্বীকার করছি, তোমার এ ছবি অতি চমৎকার হয়েছে। এর জন্যে তুমি গর্ববোধ করতে পার।

তবু—যে ডাইনোসররা প্রায় ষাট লক্ষ বছর ধরে ফসিলে পরিণত হয়ে রয়েছে, তাদের একটিকে তুমি জীবিত অবস্থায় দেখে তার ফটো তুলে নিয়েছ—এমন আজগুবি কথা আমি মানি কী করে?'

একগুঁয়েভাবে বলল লোকটি, 'কোন সংবাদপত্রের কথা এখানে আসছে না, প্রফেসর। ওই ট্র্যাকোডনটা আমার পিছু ধাওয়া করেছিল। আমি ফটোগ্রাফ নিয়েছি। আরও প্রমাণ আছে আমার কাছে। দেখবে? এই নাও, দেখ।'

আরও অনেকগুলো ছবি সে ছুঁড়ে দিল আমাকে লক্ষ্য করে। এ ছবিগুলোকেও কৃত্রিম বলে মনে হল না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে দৃশ্য বিদায় নিয়েছে এ উপগ্রহ থেকে—এখানে বিচরণকারী অতিকায় প্রাণীদের মাটির মধ্যে প্রোথিত কঙ্কাল এবং ফসিল পদচিহ্নই একমাত্র অতীতের স্মারক হয়ে রয়েছে বলে আমরা যা' জানি—লোকটির দেওয়া ওই ফটোগ্রাফগুলোকে তেমনি সব জন্তুর অতিবাস্তব জীবন্ত প্রতিকৃতি রূপে সত্যি মনে হতে লাগল আমার। একটি বা দু'টি নয়—ট্র্যাকোডনে'র একটা দল একটা নদী বা হ্রদে'র তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর, ফটোতে শুধু অতিকায় ডাইনোসরদেরই দেখা যাচ্ছে না—অতীত পৃথিবীর গাছপালা এবং লতাগুল্ম ও ঝোপঝাড়ের এত সুস্পষ্ট দৃশ্য ইতিপূর্বে আমি একটিও দেখিনি। একটু যত্ন নিয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, গাছের শাখায় পাতায় ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নাম-না-জানা বিচিত্র সব কীটপতঙ্গের ঝাঁকও! জলঘাসাচ্ছন্ন উন্মুক্ত উদার জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে কয়েকটা অতিকায় প্রাণী। ফটোতে দু'তিন জাতের ট্র্যাকোডন আমি দেখতে পাচ্ছি। কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতির ডাইনোসরও রয়েছে। কয়েক লক্ষ বছর আগের যুরাসিক পর্যায়ে যেসব ব্রণ্টোসরাস এ পৃথিবীতে বিচরণ করত, তাদেরই মত দেখতে ওগুলোকে।

'কিন্তু, তুমি ভুল করেছ', লোকটিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম, 'সরীসৃপ যুগে এত দেরীতে এই প্রাণীর কোন চিহ্ন আমরা দেখতে

পাইনি। এটা খুব সাধারণ ভুল। টাইরানোসরাস খেয়ে ফেলত ব্রণ্টোসরাসদের, আর, টাইসেরাটপস্‌রা টাইরানোসরাসদের হত্যা করত দেখতে পেলেই।'

'অতসব কথা আমি জানি না,' বলল সেই লোকটি, 'আমি নিজের চোখে যা' দেখেছি, তারই ফটো তুলেছি। ব্যস! টাইরানোসরাস আমি দেখিনি। তার জন্যে আমার কোম দুঃখ নেই। যেসব তথ্য জানিয়ে তুমি গর্ব অনুভব করছ, সেসব তথ্য আমি বইয়ে পড়েছি। তথ্যগুলো তোমার কৌতূহল জাগিয়েছে, তুমি চিন্তা করছ সেই সম্বন্ধে, ভাল কথা! টাইসেরাটপস্‌দের মাথায় এবং নাকের কাছে মোট তিনটে শিঙ্‌ রয়েছে তো? ও আমি অনেক দেখেছি। ফটোতে আছে, খুঁজে দেখ।'

একটা বিশাল নিম্নভূমির ছবি নজরে পড়ল। দূরে দূরে কয়েকটা ছোট পাহাড়। অন্যান্য ছবিগুলো'র মত অতীতের সেই আদিম প্রকৃতির দৃশ্য এ ছবির মধ্যেও পরিস্ফুট। নিঃসন্দেহে, টাইসেরাট-পস্‌দের একটা বিরাট দল—তিন-চারটি করে এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে সেই নিম্নভূমিতে বিচরণ করছে দেখা যায়। বালুকাময় দীর্ঘতৃণা-চ্ছন্ন বিস্তীর্ণ সে প্রান্তর।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম আমি। বললাম, 'বাঃ বাঃ! চমৎকার ছবি তুলেছ তো! কিন্তু তোমার ছবিগুলো বাস্তব—একথাটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আসল বিজ্ঞানীদের চোখে এর ভেতরের মারাত্মক ত্রুটিটুকু ধরা পড়ে যাবে। সরীসৃপরা কখনও দল বেঁধে ঘোরে না। ডাইনোসররা উপরিভাগে বেড়ে-ওঠা সরীসৃপ ছাড়া আর কী? নাও, তোমার ফটোগ্রাফগুলো নিয়ে নাও। এতে আমার কাজ হবে না।'

ফটোগ্রাফগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম আমি।

প্যাকেটটাকে ধরবার চেষ্টা করল না সে। আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে রইল কয়েক লহমা। তারপর কিছু আল্‌গা বালি আমার মাথার কাছের বাতাসটাকে ঘোলাটে করে দিল।

ক্ষণকাল পরেই লক্ষ্য করলাম, লোকটি নীচে খাদের মধ্যে—প্রায় আমার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর, তার পায়ের আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে আমার ডাইনোসরে'র একটা পায়ের হাড় এবং পঞ্জরাস্থিগুলো!

ক্রোধে আমার মাথার মধ্যে রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল—ওকে খুন করে ফেলি। কিন্তু ওর মত একটি জওয়ান মানুষকে কাবু করে ফেলা আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই! নিরুপায় হয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম।

'বোকার মত কথা বলো না!' রূঢ়কণ্ঠে বলল সে।

এখন আমি বুঝতে পারলাম, সেও রেগে উঠেছে আমার ওপরে।

'তোমার মত বৃদ্ধ আমাকে মিথ্যেবাদী বলবে, এ আমি দ্বিতীয়বার শুনতে রাজী নই। মরা হাড় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান প্রচুর থাকতে পারে; কিন্তু জীবিত প্রাণীদের সম্পর্কে তোমার শিক্ষাদীক্ষার দিকটা করুণভাবে অবহেলিত, প্রফেসর। সরীসৃপরা কখনও দল বাঁধে না? কুমীররা কী করে? গোসাপেরা? তোমার নাকের ডগার বাইরে তুমি কিছু দেখতে পাও না বলে মনে হচ্ছে। কখনই দেখতে পাবে না! এখান থেকে তিন বা চারমাইল দূরে, মাত্র চব্বিশঘণ্টা আগে আমার ক্যামেরা দিয়ে ওইসব জীবন্ত ডাইনোসরের ফটোগুলো তুলেছি আমি। এবং যে কোন সময়ে ইচ্ছা করলেই আমি আবার তুলতে পারি। আর তুলবও!'

সে একটু দম নিল।

আমি শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটা ব্যাগের ভেতর থেকে শুষ্ক চক্‌চকে এক আবরণে মোড়া সচ্ছিদ্র বস্তু বার করল সে।

'এটা কী, বলো।'

হাতে নিয়ে যত্নের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে বস্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। ডিমের খোলার একটা টুকরো। সরীসৃপ জাতীয় কোন প্রাণীর ডিম নিঃসন্দেহে। আকারে বেশ বড়ই। এর বেশী আমি আর কিছু বুঝতে পারলাম না।

'হয়তো কুমীরের ডিম।' আমি বললাম, 'কিংবা কোন বৃহৎ অণ্ডজ সাপও এ ডিম পেড়ে থাকতে পারে। তবে সেটা নির্ভর করছে যে স্থান থেকে এটাকে তুমি পেয়েছ, তার ওপরে। আমার মনে হয়, এটা কোন ডাইনোসরের ডিম বলেই তুমি দাবী করছ।'

'আমি কিছুই দাবী করছি না।' তার প্রত্যুত্তর, 'তোমারই তা করা উচিত। কারণ, ডাইনোসর সম্বন্ধে তুমি বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে প্রচার করছ। আমি তা' নয়।'

মানুষটি জামার পকেট থেকে দু'টো ডিম বার করল। দৈর্ঘ্যে প্রায় আমার হাতের তালুর সমান। ধূসর-সাদা রঙ্। গঠনে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ডিমের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

ডিম দুটোকে সে সূর্যের আলোর দিকে তুলে ধরল।

'এই ডিমটা তাজা!' বলল সে, 'বাসার চারপাশের বালি তখনও ভিজে ছিল। আর, এটাকে পেয়েছি ডিমের খোলাটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে।'

পৃথকভাবে ডিম দুটো দেখাল আমাকে।

'এই পুরোনো ডিমটার ভিতরে কিছু আছে। ইচ্ছা হলে তুমি ভেঙে দেখতে পার।'

ডিমটাকে আমি হাতে নিলাম। ওজনে বেশ ভারী বলে মনে হল। মোটা দিকটার রঙ্ বিবর্ণ হয়ে গেছে। সত্যিই ভেতরে যেন কিছু রয়েছে একটা।

একটু ইতস্তত করলাম আমি। উবু হয়ে বসলাম। ডিমটাকে বালুকাপ্রস্তরের মধ্যে প্রোথিত একটা কোরাইথোসরের মাথার পাশে

রেখে খোলা ফাটিয়ে ফেললাম। একটা পূতিগন্ধে ভারী হয়ে উঠল চারপাশের বাতাসটুকু। ডিমের ভেতরের অংশটা সবুজ-হল্‌দে হয়ে গেছে। বহুদিন আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ডিমের যেমনটি হওয়া সম্ভব। যে অপরিণত শিশুপ্রাণীটা ডিমের ভেতরে ছিল, সেটাকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখলাম। অতঃপর উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'ডিমটা কোথায় পেয়েছ তুমি?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

এতক্ষণে যেন একটা জয়ের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

সে বলল, 'আমি তোমাকে তা' আগেই বলেছি। এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে, জঙ্গলের যে-বেষ্টনী জলাভূমিটাকে পৃথক করে রেখেছে, ডিমটাকে পেয়েছি আমি ওখান থেকে। কয়েক ডজন পড়ে ছিল। গরম বালির ওপরে। আমি দুটো ভেঙে দেখেছি। একটা তাজা ছিল।'

হঠাৎ আমি একটু কৌতুক বোধ করলাম। কচ্ছপের ডিমও তো বালির মধ্যে থাকে। সচরাচর যা চোখে পড়ে না, তেমনি দুর্লভ কোন বড় জাতের কচ্ছপের ডিমও তো হতে পারে এটা।

লোকটিকে আমি বললাম সেকথা।

শুনে, সে বলল, 'হ্যাঁ। তেমন কোন কচ্ছপের হতে পারে বৈকি! কিন্তু আমার এই ফটোগ্রাফগুলো? বেশ—আমি আবার আসব। তোমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমি আরও তথ্য প্রমাণ নিয়ে আসছি। জগতকে আমি প্রমাণসহযোগে দেখিয়ে দেব, যে, অতীত পৃথিবীর ক্রেটেসাসযুগের মধ্যভাগে আমি ফিরে গিয়েছিলাম। আমার জন্মের ষাট্‌লক্ষ বছর আগের যুগে আমি আরাম এবং আনন্দের সঙ্গে বসবাস করেছিলাম সেখানে।'

লোকটি চলে গেল। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল তার পায়ের শব্দ।

আমি তার যাত্রাপথের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইলাম।

দূরের বালুকাপ্রস্তরে সূর্যের আলো পড়ায় একটা লোহিতাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকে।

আমার মনের মধ্যে একটা কথাই বার বার ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই ডিম যদি বড়জাতের কোন কচ্ছপের না হয়, তাহলে—আর কোণ প্রাণীর! কী সে প্রাণী?

মানুষটি কি শুধুই আবোল-তাবোল বকে গেল পাগলের মত?

আমার যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে নিয়ে চিন্তিতভাবে ক্যাম্পের দিকে ফিরে চললাম আমি।

॥ দুই ॥

কোরাইথোসরের কঙ্কাল উদ্ধার করতে আমাদের কেটে গেল আরও কয়েকটা দিন। তারপর মিউজিয়মে গিয়ে পৌঁছতে ওয়াগন, ট্রাক, ট্রেনযোগে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে সেগুলোকে।

সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্লাষ্টার বস্ত্রবন্ধনীর সাহায্যে সেগুলোকে এমনভাবে সংরক্ষিত করে রাখতে হল, যাতে তাদের কোনরকম ক্ষতি না হয়!

ইতিমধ্যে সেই লোকটির সঙ্গে একবার অল্পক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছিল আমার। তখন তার নামটা জানতে পেরেছি।

নলিনাক্ষ রায়।

নলিনাক্ষর দেখানো সেই বিস্ময়কর ডিম দুটোর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না!···

ক্রেটেসাস যুগে কোন সমুদ্রতট ছিল এমন একটি প্রাচীনস্তরের সন্ধান পাই আমি, আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। মহাকালের নির্মম আঘাত থেকে জায়গাটি বিস্ময়করভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে। প্রতিটি তরঙ্গচিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের বিবরস্থানও অক্ষত রয়েছে সেখানে। পায়ে চলা পথের চিহ্ন বর্তমান—যার সামান্যতম অংশও সংরক্ষিত করে রেখে যে কোন মিউজিয়াম গর্ববোধ করতে পারে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে ছোট বড় ডাইনোসররা এই পথে যাতায়াত

করেছিল। ভিজেবালির বুকে রেখে গেছে তাদের পায়ের চিহ্ন—মাটির মধ্যে প্রোথিত থেকে ফসিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

সমুদ্রতটের অপর পার্শ্বে ছিল জলাভূমি এবং চোরা বালি।

একটুকরো সাদা হাড় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। দৃষ্টি ছিল সম্মুখের এক ক্ষুদ্র বিবর্ণ পাহাড়ের দিকে। পেছনে আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

নলিনাক্ষ এসে হাজির হল।

লক্ষ্য করলাম, অল্প কদিনের মধ্যেই চেহারার বেশ একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে তার। সারা দেহটা কেমন যেন মলিন হয়ে উঠেছে। মাথার চুল তো লম্বা ছিলই, খোঁচা খোঁচা দাড়িতেও মুখ ভর্তি। চোখের কোলে কালি জমেছে, শরীরের পোষাক ছিন্নমলিন।

আর, তার বাঁ হাতটা একগুচ্ছ পাত্‌লা চকচকে ধাতব বস্তু দিয়ে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা!

একটা আশ্চর্য পাখী, দেখলাম—তার ডান হাতের মুঠোয় রয়েছে বন্দী! জীবিত, কি মৃত বুঝতে পারলাম না। তবে, এ ধরনের পাখী আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি।

পাখীটাকে নলিনাক্ষ ছুঁড়ে ফেলে দিল আমার পায়ের কাছে।

এবার আরও ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম।

পাখীটা মৃত। সেটার মাথা টকটকে লাল, গলা সরু এবং ধূমল-বর্ণ। স্থূল পালক জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়েছে ঘাড় থেকে। ডানার সন্ধিস্থলে রয়েছে তিন আঙুল বিশিষ্ট ছোট ছোট হাতের মত অঙ্গ। চোখের পাতা নেই। ডানার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলুদবর্ণের দাঁত রয়েছে মুখভর্তি।

পাখীটার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমি। নলিনাক্ষর মুখের দিকে তাকালাম।

ঠোঁটে তার এখন হাসি নেই। পাথরের বুকে পায়ের চিহ্নগুলো লক্ষ্য করছিল সে।

'সমুদ্রতট তুমি দেখতে পেয়েছ তাহলে!' নলিনাক্ষর কণ্ঠস্বর অবসন্নতায় যেন ঝিম হয়ে এসেছে, 'জলাভূমি আর সমুদ্রের মধ্যে বালুকাময় সঙ্কীর্ণ ভূভাগ ছিল এই জায়গাটা। আহার্যের সন্ধানে তারা এখানে আসত। আবার নিজেই কেউ কেউ নিজেদের আহার হয়ে যেত। চোরাবালির মধ্যে পড়ে ডুবে মরতে কেউ কেউ। বুঝলে —আমি ওইখানে ছিলাম। পাখীটাকে পেয়েছি ওই-খানেই। জীবিত অবস্থায় ছিল। সেই অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে একই ভূতাত্ত্বিক যুগের পাখী ওটা। এখন তুমি প্রমাণ পেলে? এ প্রমাণ তুমি অস্বীকার করতে পার না। পরীক্ষা করে দেখ পাখীটাকে। ওটাকে নিয়ে যা খুশী করতে পার তুমি। এখন আমি তোমার একটু সাহায্য চাই।'

পাখীটার আঁশ-যুক্ত লম্বা একটা ঠ্যাং ধরে ওপর দিকে আমি তুলে ধরলাম। বহু লক্ষ বছর এ পৃথিবীতে বুকে এ জাতীয় পাখীর অস্তিত্ব নেই!

'বেশ,' আমি বললাম, 'তুমি কী চাও বলো। তোমার সঙ্গে কি আমি যাবো? তোমার হাতে কী হয়েছে?'

'আমার সঙ্গে এসো। সব কথা জানতে পারবে।' নলিনাক্ষ বলল।

দীর্ঘতৃণাচ্ছন্ন উন্মুক্ত প্রান্তরটি মাইল তিনেক অতিক্রম করে নলিনাক্ষর আবাসস্থলে এসে পৌঁছলাম আমি।

একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের তীরে অবস্থিত সর্বাধুনিক মডেলের—এক সুবিশাল ধাতব বাক্সের মত দেখতে, নলিনাক্ষর বাড়িটা। কাছেই একটা পাওয়ার হাউস। এই নির্জনমরু সদৃশ স্থানে ইলেকট্রিসিটি আলো—সবই নলিনাক্ষর কৃতিত্ব।

বাড়ির একটা দিকে কোন জানলা নেই। খাড়া উঁচু দেওয়াল। ঢালু ছাদের কাছে মাঝে মাঝে বায়ুনির্গম পথ রয়েছে।

শুনলাম, ওদিকটা নলিনাক্ষর ল্যাবরেটরী।

নলিনাক্ষ ষ্টীলের দরজার চাবি খুলল। ঠেলে খুলল দরজাটা।

আমি তাকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

কোণের দিকে একটা চওড়া ডেস্ক্ রয়েছে। সেটার ওপরে একটা বুকসেল্ফ। একটা বড় সুইচ্ বোর্ড রয়েছে বিপরীত দিকে দেওয়ালে। সুইচ্বোর্ডের উভয় পার্শ্বে দুটি বড় ডি সি জেনারেটর।

অনেকগুলো আলমারী দেখতে পাচ্ছি। আর একটা লম্বা টেবিলের ওপরে নানান্ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রপাতি সাজানো।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হলাম আমি যে জিনিসটার প্রতি সেটা হল ঘরের কন্ক্রিট্ মেঝের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বিচিত্রদর্শন যন্ত্র!

মনে হল, সীসের তৈরী, গোল ডিম্বাকৃতি। উচ্চতায় প্রায় দশ ফিট্, পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ ফিট্ হবে প্রস্থে। অনেকগুলো ষ্টীল-বন্ধনীর দোলনার সঙ্গে সেটা যুক্ত রয়েছে।

যন্ত্রটির একটা অংশ উন্মুক্ত। দরজার মত দেখতে।

সেই উন্মুক্তস্থান দিয়ে ভেতরের কিছু অংশ দৃষ্টি পথে প্রকট হয়ে ওঠে। সেটা একটা কুঠুরী। কোন প্রকারে একটি মানুষের জায়গা হতে পারে তাতে। নানা আকারের ডায়াল আর সুইচবোর্ড যত্রতত্র —অসংখ্যও!

জেনারেটরের একঘেয়ে শব্দে ল্যাবরেটরীর অভ্যন্তরভাগ পরিপূর্ণ। বাতাসে ওজোন গ্যাসের আধিক্য নাকে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

নলিনাক্ষ দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'যন্ত্রটি তোমাকে আমি পরে দেখাব। প্রথমে আমাকে একটু সাহায্য কর তুমি। বাঁধনটা খুলে দাও।'

তার হাতের বাঁধনটা আস্তে আস্তে খুলে দিলাম।

'ঈস! একী হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠলাম আমি।

দেখলাম নলিনাক্ষর বাঁ হাতটাকে কে যেন ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। ক্ষতস্থানে উজ্জ্বল সবুজ রঙের এমন এক মলম প্রয়োগ করা হয়েছে, যার গন্ধটা আমি চিনতে পারলাম না। রক্তক্ষরণ বন্ধ! তবে হাড়গুলো যেন ভাঙা!

নলিনাক্ষ বলল, 'আমাকে খাবার ইচ্ছা হয়েছিল তার। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, প্রফেসর।'

ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে ডান হাতটা ভরে দিল তাতে। হতাশ হয়ে বলল, 'না, কোন পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো এখানে নেই। অন্য-জায়গায় আর খুঁজব কখন? যেমন ছিল, সেই ভাবেই আবার বেঁধে দাও।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'না, না, এভাবে রাখা উচিত নয়। তোমার হাতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কোন ডাক্তারের শরণ নেওয়া উচিত।'

মাথা নাড়ল নলিনাক্ষ। 'বললাম তো অত সময় আমার হাতে নেই। ডাক্তার আছে শহরে। এখান থেকে অনেক দূরে। আর, এদিকে মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমার শক্তিসঞ্চার যন্ত্রগুলো পূর্ণ-গতিতে কাজ সুরু করে দেবে। একচল্লিশ মিনিটে শুরু হবে আমার যাত্রা! পেছনে—অতীত পৃথিবীর দিকে।'

ঘরের মধ্যে একটা লেবুর ঝুড়ি পড়ে ছিল। সেটাকে দেখিয়ে নলিনাক্ষ বলল, 'ওটা থেকে কিছু শক্ত কাঠি বের করে নাও। স্প্লিণ্ট্-এর মত করে হাতে বেঁধে দাও। ওতেই আমার কাজ হবে।'

নিরুপায় হয়ে নলিনাক্ষর কথামতই কাজ করতে হল আমাকে।

নলিনাক্ষ'র সেই অসুস্থ হাতখানাকে একগুচ্ছ শক্ত কাঠি এবং সেই ধাতব রূপোলী বস্তু ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একখণ্ড সরু কাপড়ের ফালি দিয়ে গলায় মালার মত করে ঝুলিয়ে দিলাম।

একটু সুস্থবোধ করে নলিনাক্ষ বলল, 'এবার আমি তোমাকে

সব কথাই বলতে পারব, প্রফেসর। সব কিছু মেনে নেওয়া বা না নেওয়া তোমার ওপরে নির্ভর করছে। তোমার পেছনে ওই বেঞ্চের ওপরে লক্ষ্য করো। ওই যে পেঁচালো স্প্রিং—ওটা হীলিক্স। ডাইমেনসন বলতে আমরা বুঝি, কোন দিকের রৈখিক মান বা মাপ, যথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা। দি স্পেস্ অভ ওয়ান ডাইমেনসন, অর্থাৎ রেখা। স্পেস্ অভ টু ডাইমেনসনস্—ক্ষেত্র। আর ঘনক্ষেত্র বলতে বোঝা—দি স্পেস্ অভ থ্রি ডাইমেনসনস্। কেমন, তাই তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

নলিনাক্ষ বলতে লাগল, 'ওই হীলিক্স'টা আর কিছুই নয়—একটি তৃতীয় ডাইমেনসনে অর্থাৎ ঘনক্ষেত্রে মোচড় খাওয়া কতকগুলো আড়ভাবে কাটা ক্ষেত্রযুক্ত প্যাঁচ্ দিয়ে তৈরী যন্ত্র। যদি তুমি ওটার ওপরে দু'টো দাগ দাও, তাহলে ওই স্প্রিং বেয়ে একটা দাগ থেকে অন্য দাগটিতে পৌঁছতে প্রায় ছ'ইঞ্চিস্থান অতিক্রম করতে হবে ঘুরতে ঘুরতে। অথবা, একটা প্যাঁচ্ থেকে পরের প্যাঁচটায় তুমি সোজা নেমে যেতে পার। মনে কর, তোমার দুটো চিহ্নই একসঙ্গে এল—তাহলে? আড়ভাবে অতিক্রম করলে কোন দূরত্বই নেই ওই দুটো দাগের মধ্যে।

'স্থান এবং সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো, প্রফেসর। এই স্প্রিংয়ের গায়ে প্রথম দাগ—এটা আজ অর্থাৎ বর্তমান। তার চেয়ে একটু তফাতে হবে আগামীকাল। তারপর আগামী বৎসর। এবং এখানে আরও পরের সময়, যখন কয়েলটা একবার পুরো ঘুরে প্রথম চিহ্নটার সোজাসুজি ওপরে এসে দাঁড়ায়।

'এখন লক্ষ্য করো, আমি আজ থেকে আগামীকালে যেতে পারি—পরের বছরেও, এই স্প্রিং বেয়ে এইভাবে সময়ের সঙ্গে

বেড়াতে বেড়াতে। এবং পৃথিবী তাই করছে। কেবল ফিজিক্সের নিয়মানুযায়ী—পিছন দিকে যাওয়া নেই! এটা একমুখো রাস্তা। আরও একটা কথা, সময় তোমাকে যে গতিতে নিয়ে যেতে চায়, তার চেয়ে বেশী গতিতে তুমি যেতে সক্ষম হবে না। ওই স্প্রিং'টিকেও তুমি যদি অবলম্বন করে চলো, সেই রকমই ঘটবে। কিন্তু তুমি সোজাভাবে অতিক্রম করে যেতে পার।

'এখন লক্ষ্য করো, দু'টো চিহ্ন আমি দিয়েছি। একটা এখন এবং অন্যটা এখন থেকে দু'বছর দূরে। দুটো চিহ্নের মধ্যে ব্যবধান—জড়ানো তার বেয়ে দু'ইঞ্চি। কিন্তু যখন তুমি স্প্রিংটির ওপরে চাপ দিলে, তখন চিহ্ন দুটো এক সঙ্গে মিলিত হল। দু'টির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, রয়েছে শুধু দুটো কয়েলে'র পৃষ্ঠভাগ। পৃষ্ঠভাগ দুটিতে একটা সেতুর সংযোগ স্থাপন করলে তুমি। এক কথায়, এখন থেকে তুমি দু'বছর আগে চলে যেতে পারবে সেই সেতু ধরে। কিংবা, সেই একই উপায়ে দু'বছর অতীতেও তুমি চলে যেতে পার।

'সময় স্প্রিংয়ে'র মত জড়িয়ে আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন যুগ আমাদের পরেই অপেক্ষা করছে—একটা শক্তি অস্পৃশ্য এক সীমানা তৈরী করে রেখে, যার ফলে আমরা সেটা দেখতে পাই না! অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পাশাপাশি। কেবল এটা দু'বছর বা তিনবছর, এমনকি একশ বছরও নয়। আজ থেকে ষাটলক্ষ বছর দূরে—অতীতে চলে যাওয়া! বুঝতে পারছ?

'আমি তোমাকে বলেছি যে, তুমি সময়ের একটা প্যাঁচ্ থেকে পরের প্যাঁচে পৌঁছবার জন্যে একটা সেতুর সংযোগ স্থাপন করতে পার। আমি সেই সেতু তৈরী করেছিলাম—সেই সেতু বেয়ে ষাট্লক্ষ বছরের অতীত পৃথিবীর ডাইনোসর'দের যুগে পদার্পণ করেছিলাম আমি।'

নলিনাক্ষ থামল।

তার দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার যেন একটা সুযোগ দিতে চাইল সে আমাকে।

সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার চেষ্টা আমি করলাম না। নলিনাক্ষ'র কথামত, সময় যদি স্প্রিংয়ের মত পেঁচালো হয় এবং যদি তার এই ডিম্বাকৃতি যন্ত্রটা সময়ের সেতু'র কাজ করে—তাহলে তার তোলা ফটোগ্রাফ, ডিম এবং হিংস্র প্রকৃতির দাঁতাল পাখী, সব সত্যি!

নলিনাক্ষ আবার বলে চলল, 'আমার এই টাইম মেশিনে একটা প্যাঁচ্ থেকে আর একটা প্যাঁচে তুমি গড়িয়ে যেতে পার—ষাট লক্ষ বছর একই সঙ্গে পার হয়ে যাবে। আমি যদি ষাট লক্ষ বছর আগে বা পেছনে চলে যাই, এবং সেস্থানে চারদিন বসবাস করি, পরের মঙ্গলবার দিন আমি ফিরে আসব এখানে—এখন থেকে চারদিন পরে।'

ডিম্বাকৃতি মেশিনটা'র দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল নীরব রইল নলিনাক্ষ। যখন অতিকায় দৈত্যের মত ডাইনোসররা পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করত, সেই লক্ষ লক্ষ বছরের অতীত দিনগুলোর কথা যেন মনে করতে লাগল সে। তার দৃষ্টির সামনে বুঝি ফুটে উঠছিল, ক্রেটেসাস-যুগের দীর্ঘতৃণাচ্ছন্ন জলাভূমিতে পালে পালে ট্রাইসেরাটপস্‌রা বিচরণ করছে!

'আমি তোমাকে সম্পূর্ণ কাহিনীটা বলব, প্রফেসর। যদি ইচ্ছা হয়, গল্পের শেষাংশটুকু তুমি লিখে রেখ। ষাট লক্ষ বছর—সুদীর্ঘ সময়!'

নলিনাক্ষ আমাকে বলেছিল।

॥ তিন ॥

সেই টাইম মেশিনে চেপে অতীত পৃথিবীর এমন এক যুগে গিয়ে পৌঁচেছিল নলিনাক্ষ, যখন মানুষের জন্মই হয়নি পৃথিবীতে!

চারিদিকে উন্মুক্ত উদার জলাভূমি থেকে কুয়াশার মত বাষ্প উত্থিত হচ্ছে!

মরুভূমি উপত্যকার সীমাহীন বিস্তৃতি—দৃষ্টিকে পরাভূত করে।

তেমনি একস্থান থেকে ফটো তুলেছে নলিনাক্ষ।···

একটা কোরাইথোসর ঘুরে ঘুরে তৃণ ভক্ষণ করছিল।

তার একটা ছবি নেওয়ার জন্যে ক্যামেরা রেডি করে এগিয়ে গেল নলিনাক্ষ।

কোরাইথোসর'টি নলিনাক্ষকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে গরুর মত এক আওয়াজ তুলে তাড়া করল তাকে।

আহারে বিঘ্ন ঘটায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কোরাইথোসরটি।

প্রাণভয়ে নলিনাক্ষ ঊর্ধশ্বাসে ছুটল—দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না তার। ফার্নগাছের জঙ্গলে ঢুকে নিজেকে যখন একটু নিরাপদ বলে মনে করল, তখন আর কোরাইথোসরটিকে দেখা গেল না।

জঙ্গলের মধ্যে সে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। হাতেতালি বাজিয়ে বড় বড় মশা এবং মাছির ঝাঁককে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। একজায়গায় সে দেখতে পেল, একটা শৃঙ্গহীন বাচ্চা ডাইনোসর জঙ্গলের ধার ঘেঁসে গরম বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ছে। কাছেই পড়ে ছিল গোটাকুড়ি ভারী ডিম।

একটু পরেই বাচ্চা ডাইনোসরটি দূরে চলে গেল থপ্‌ থপ্‌ করে।

নলিনাক্ষ এ সুযোগ ছাড়ল না। একটা ডিম তুলে নিল সেখান থেকে। তাজা ডিম। অন্য জায়গা থেকে আর একটা ডিম সংগ্রহ করল।

নলিনাক্ষ'র কাছে এখন ফটোগ্রাফ আছে—স্পেসিমেন অর্থাৎ নমুনা রয়েছে—এবং সূর্যও অনেক নীচে নেমে এসেছে এখন।

সমুদ্রতটে লবণাক্ত জলাভূমির কাছ থেকে এমন সব আওয়াজ তার কাণে আসতে সুরু করল, যাতে সেখানে নিজেকে আর নিরাপদ বলে মনে করতে পারল না সে। অতএব টাইম মেশিনে চেপে আবার বর্তমান সময়ে ফিরে এল নলিনাক্ষ।

…এবং আমি তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। তার দেওয়া প্রমাণ আমি বিশ্বাস করিনি। মনে মনে পাগল ভেবেছি তাকে!

নলিনাক্ষ আবার গিয়েছিল।…

তার বাবা ছিল একজন জাঁদরেল শিকারী। বাবার একটা শক্তিশালী মজবুত রাইফেল এবার সঙ্গে ছিল তার।

সেই রাইফেল দিয়ে নলিনাক্ষ কী করতে চেয়েছিল, আমি জানি না। হয়তো টাইসেরাটপস্ শিকার করতে চেয়েছিল—যেহেতু তার তোলা ফটোগ্রাফগুলো আমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারিনি। তিনশিঙ্ওলা টাইসেরাটপস্-এর মাথা সে হয়তো কেটে নিয়েছিল আমাকে দেখাবে বলে। কিন্তু তার মেশিনে স্থানাভাব যথেষ্ট। তাই আনা সম্ভব হয়নি। তার নিজের জন্যে ছিল প্রচুর জল এবং আহার। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাতে আমাকে দেখাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ না আসবে, ততক্ষণ সেখানে অবস্থান করার সঙ্কল্প নিয়েই তো গিয়েছিল সে!……

দিগন্ত-ছোঁয়া নীচু পর্বতশ্রেণীর দিকে নলিনাক্ষ সতর্কভাবে এগিয়ে চলছিল।

টাইসেরাটপস-এর পাল ইতস্তত বিচরণ করছে।

নলিনাক্ষ'র দিকে তারা এতটুকুও মনোযোগ দিল না। অবশ্যি, প্রথম থেকেই সে সতর্ক ছিল। সে মনে মনে চিন্তা করল, টাইসেরাটপসদের একেবারে ছায়ার কাছাকাছি থাকলে তাদের নজরটা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। বেশী দূরে থাকলে নলিনাক্ষকে তারা দেখতে পাবে।

টাইসেরাটপসরা তৃণভোজী। নলিনাক্ষর মত একটা মানুষ টাইসেরাটপসদের শত্রু হতে পারে না।

শুধু একবারমাত্র একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটে গেল।

লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে একটা ফুট আটেকে'র বাচ্চাকে লক্ষ্য না করে তার গায়ের ওপরে পড়ে গিয়েছিল নলিনাক্ষ!

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুড়ো টাইসেরাটপস শিঙ নেড়ে হিসহিসে গর্জন করে নলিনাক্ষকে লাল কুতকুতে চোখ পাকিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল!

ঘুরতে ঘুরতে উটপাখীর মত একটা প্রাণীর দিকে দৃষ্টি পড়ল নলিনাক্ষর। সে প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে এই প্রথম গুলী ছুঁড়ল সে। তারপর একটা উপযুক্ত জায়গা দেখে শুকনো ঘাস জেলে প্রাণীটাকে পুড়িয়ে নলিনাক্ষ প্রথমে একটু চেখে দেখল!

বাঃ! সুন্দর! ফাউলের চাইতে কোন অংশে খেতে খারাপ নয়!

অবশেষে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়-থেকে-নামা ঝরণার কাছে গিয়ে পৌঁছল নলিনাক্ষ। ঝরণাটি'র উৎসস্থলের দিকে সে এগিয়ে চলল।

পাহাড়ের ওপরে কিছুদূর উঠে একটি স্থান বেছে নিলে। জায়গাটিকে বেশ মনোরম এবং নিরাপদ বলেও মনে হল প্রথমে। কিন্তু একটু ইতস্তত দৃষ্টি ফেলতেই সে এমন কিছু কিছু পায়ের ছাপ দেখতে পেল, যা' এখানে থাকতে পারে, নলিনাক্ষ ভাবেনি। কিংবা, দেখতেও সে চায় না। টাইরানোসরাস বা তারই সমগোত্রীয় কোন অতিকায় ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীদের পদচিহ্ন সেগুলো!

আর কালবিলম্ব না করে নলিনাক্ষ সেখান থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে যেন ছটফট করতে লাগল।

তার খাবারের প্যাকেটের ভেতরে কতকগুলো ছোট ছোট প্রাণী কখন কোন্ সুযোগে ঢুকে পড়েছিল, কে জানে! নলিনাক্ষ আশ্চর্য হয়ে দেখল, তার আহার্য বস্তুতে অকৃপণভাবে ভাগ বসিয়েছে সেগুলো। প্রাণীগুলো ইঁদুরের মত দেখতে—কিন্তু বোধহয় ইঁদুর নয়! বাদামী রঙের।

নলিনাক্ষ একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দিল একটা প্রাণীকে লক্ষ্য করে। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত শিলানুড়ির ফাঁকে ফাঁকে প্রাণীগুলো নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আহা'রে! নলিনাক্ষ আপসোস করল নিজের মনে। সঙ্গে করে সে যদি একটা ইঁদুরধরা কল নিয়ে আসত! অতীত পৃথিবীর একটা অন্তত জীবিত প্রাণীকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারত তাহলে। মেশিনটা ছোট হলেও, প্রাণীটার স্থান সঙ্কুলান হতই!

॥ চার ॥

দ্বিতীয় দিন সকালে কতকগুলো পাখীকে মাথার ওপরে উড়তে দেখা গেল।

নলিনাক্ষ পরে যে দাঁতাল হিংস্র পাখীটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, এ পাখীগুলো ঠিক সে জাতের নয়? কিছুটা গাঙচিলের মত দেখতে।

অতএব, নলিনাক্ষর মনে হল, যেদিক থেকে পাখীগুলো উড়ে আসছে, সেদিকে, পাহাড়ের ওপারে রয়েছে হয় কোন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ নিম্নভূমি, অথবা কোন সমুদ্রের খাড়ি।

নলিনাক্ষ এগিয়ে গিয়ে দেখল—অনুমান তার মিথ্যে নয়!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলো এক লম্বা গিরিপৃষ্ঠের শীর্ষদেশ। দক্ষিণ দিকে কার্নিশের আকার নিয়ে ক্রেটেসাস সমুদ্রকে স্পর্শ করেছে।

সমুদ্র এক সময়ে অনেক ওপরে ছিল। টাইসেরাটপস-এর পাল এখন যে বালুকা-আবর্জনায় তৃণপল্লবাদি ভক্ষণের জন্যে বিচরণ করছে, সেস্থানটা আগে ছিল সমুদ্রতলে নিমজ্জিত। পাহাড়ের গায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত চূণাপাথর তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ লেগে ছোটবড় অসংখ্য কালো গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল।

সমুদ্রের তীর বরাবর গভীর জঙ্গলও নজরে পড়ল নলিনাক্ষর।

দূরে, সমুদ্রের বুকে কী যেন একটা প্রাণী ভেসে উঠেছে। তিমির

মত প্রকাণ্ড শরীর। দূরবীণ সঙ্গে নিয়ে আসেনি নলিনাক্ষ। প্রাণীটাতে চিনতে পারল না এতদূর থেকে।

নলিনাক্ষ পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে ওঠার পথ খুঁজতে লাগল অতঃপর।

এইখানেই সে একটা বড় ভুল করল।

পাহাড়ের পার্শ্বদেশ বেয়ে একটা উপত্যকায় পৌঁছবার চেষ্টা করলে বুদ্ধিমানের কাজ করত সে। কিন্তু তা না করে রাইফেলটাকে গলায় ঝুলিয়ে নলিনাক্ষ খাড়াপথে শীর্ষদেশ লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। পরিশ্রমটা তাতে তার কম হল না।

কৃতকার্য হল অবশেষে। শীর্ষদেশটি ছিল একটা মালভূমি। নিম্নভাগ কিন্তু ছিল ফাঁপা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমুদ্রতরঙ্গ ওই কাজটি সমাধা করে রেখে গেছে। নীচের পাথর নুড়ির উপরিভাগ হয়ে রয়েছে অত্যন্ত ছুঁচলো। তাজা উদ্ভিদের সবুজ আস্তরণ পড়েছে সমস্ত জায়গাটিকে ঘিরে। কিছুটা অংশ জলে ডোবা।

নলিনাক্ষর মনে হল, আহারের লোভে কোন কোন প্রাণী ওখানে আসতে পারে।

নলিনাক্ষর মনে হল, আহারের লোভে কোন কোন প্রাণী ওখানে আসতে পারে। এখানে বসে সে প্রাণী শিকার করা বা তার ফটোতোলা নলিনাক্ষর পক্ষে হবে খুবই সোজা। যে প্রাণীই ওখানে আসুক, আকারে সেটা ছোট হবেই।

পর্বতগাত্রের গহ্বরগুলোর কথা নলিনাক্ষর মনে ছিল না। উঁচু খিলানের মত সৃষ্টি করে কোন কোন সুড়ঙ্গ অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

আচমকা একটা শব্দ শুনে নলিনাক্ষর আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

হিস্‌স্‌! হিস্‌স্‌!!···

পেছন দিকে ঘাড় ফেরারেই নলিনাক্ষর নজরে পড়ল, একটা সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আদিম একটা প্রাণীর ভয়ঙ্কর-দর্শন মুখ কাৎ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এক-একটা দাঁতের মাপ আট ন' ইঞ্চির কম হবে না! প্রাণীটার মুখ গলা এমনই প্রকাণ্ড যে বার তিনেক গপ্ গপ্ করেই নলিনাক্ষকে তার রাইফেলসহ সে গিলে খেতে পারে।

নলিনাক্ষ দৌড়ল প্রাণের ভয়ে—খরগোসের মত। কিন্তু ভূমি তো সমতল নয়—পার্বত্য! ফলে, কখনও কখনও নলিনাক্ষকে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় লাফিয়েও যেতে হচ্ছে!

অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল সে। তার মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে শরীরটা এলিয়ে পড়বে।

তবু পাহাড়ের গা বেয়ে ইতস্তত দৌড়তে লাগল সে। এক সময়ে একটা কার্নিসের মত বেশ চওড়া স্থান নজরে পড়ল তার। একটা ঘোরাপথ অতিক্রম করে গেলেই সেখানে পৌঁছনো যাবে।

নলিনাক্ষ সেই পথটা বেছে নিল।

সে পথ দিয়ে দৌড়বার সময়ে তার নাকে এল এক দুর্গন্ধ! নীচের দিকে দৃষ্টি পড়ল তার।

একটা জলাভূমি। সেখান থেকে কুয়াশার মত বাষ্প নির্গত হচ্ছে। আর, সেই স্বল্প জলে গা ডুবিয়ে পড়ে রয়েছে এক ঝাঁক কুমীরের মত প্রাণী—কিন্তু কুমীরের চাইতে আকারে বড়।

কার্নিসের মত জায়গাটাতে পৌঁছবার জন্যে নলিনাক্ষ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার বুকের কাছে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ছে।

কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষর মাথাটা ঝাঁ করে ঘুরে গেল যেন!

পাহাড়ের ওপরে যে প্রাণীটার তাড়া খেয়ে নলিনাক্ষ এত দুর্গম বন্ধুর পথ কায়ক্লেশে অতিক্রম করে এল, সেই ভয়ঙ্কর-দর্শন প্রাণীটা কখন কোন সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে তার আগেই এখানে চলে এসেছে! অপেক্ষা করছে তার জন্যে!

প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল নলিনাক্ষ।

নড়ে উঠল প্রাণীটার প্রকাণ্ড ল্যাজ। সামনের পা দুটো থাবার মত এগিয়ে দিল নলিনাক্ষর দিকে।

নলিনাক্ষ গুলী ছুঁড়ল।

প্রাণীটার গলার কাছ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তের ধারা। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিংস্র থাবার প্রচণ্ড আঘাতে নলিনাক্ষর হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল। উষ্ণ তাজা রক্তের ধারায় ভেসে গেল নলিনাক্ষর সর্ব অঙ্গ। এবং এই সুযোগেই তার বাঁ হাতটাকে প্রাণীটা মুখে পুরে ফেলল। কড়মড় করে চিবোতে লাগল হাতের হাড়গুলোকে।

নলিনাক্ষর গলা থেকে একটা আর্তকরুণ চীৎকার বেরিয়ে এল!

পরক্ষণেই প্রাণীটার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল রক্তপিচ্ছিল স্থানটির ওপর। তার দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল হয়ে গেল শিথিল।

এতক্ষণে নলিনাক্ষর ক্ষতবিক্ষত বাঁ হাতখানা মুক্তি পেল। দারুণ যন্ত্রণায় যেন নীল হয়ে উঠতে লাগল তার শরীরটা।

পাহাড়ের গায়ে পিঠ রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নলিনাক্ষ। চোখের পাতা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে দৃষ্টি তার রুদ্ধ করে দিল!

এমনি ভাবে কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল, তার হিসেব নেই।

হঠাৎ আবার সেই রক্ত হিম করে দেওয়া গর্জন কানে এল নলিনাক্ষর!

দৈত্যটাও কি বেঁচে উঠল আবার।

নলিনাক্ষর হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। চোখ খুলেই সে দেখল, তার সামনে উপস্থিত হয়েছে নতুন আর এক আগন্তুক! তেমনি অতিকায় এবং ভয়ঙ্কর!

সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত প্রাণীটার ওপরে। উন্মত্তভাবে সেই মৃত-দেহটাকে থাবা মেরে, দংশন করে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে চাইল যেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবিত অবস্থায় না পেয়ে তার ক্রোধ বুঝি দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

দৃশ্য দেখে নলিনাক্ষর চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তার নাগালের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট ফাটল দেখতে পেল সে। সেটার দিকে নলিনাক্ষ পা পা করে এগিয়ে গেল। তারপর সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল ফাটলটির মধ্যে।

কিন্তু প্রাণীটার দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারল না।

নলিনাক্ষকে লক্ষ্য করে ফাটলটার কাছে এসে দাঁড়াল সেটা। সেটার দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ নিঃশ্বাস নলিনাক্ষ তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

আর, তারপরেই—প্রাণীটাকে আর দেখা গেল না!

না, এটা স্বপ্ন নয়। এই পাহাড়—অতিকায় প্রাণীটার খণ্ডিত এক ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে দৃষ্টির সামনে—কিন্তু জীবন্ত প্রাণীটা নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছে! তার বদলে দেখা যাচ্ছে খানিকটা নীলাভ বাষ্প সূর্যের আলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে!

নীলাভ বাষ্প—এবং একটা কণ্ঠস্বর!

কণ্ঠস্বরটা, নলিনাক্ষর মনে হল একটি কিশোর বালকের। বালকটিকে দেখতেও পেল নলিনাক্ষ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপরিচিত ভাষায় কী যেন বলছে সে।

ছেলেটির গায়ের রঙ্ ধবধবে ফর্সা। মাথায় কুচকুচে কালো চুল। তার হাত এবং পা ছাড়া শরীরের প্রায় সমস্ত অংশ একটা চক্‌চকে উজ্জ্বল ধাতব পোষাকে ঢাকা রয়েছে!

ছেলেটিকে দেখে নিজের শরীরের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল নলিনাক্ষ।

ছেলেটির হাতে একটা সরু নলযুক্ত কালো সিলিণ্ডার। নলিনাক্ষর দিকে সেটাকে তুলে ধরে তেমনি অপরিচিত ভাষায় কী যেন বলতে লাগলেন সে।

ক্ষণকাল নলিনাক্ষ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে চেয়ে। তারপর তার জ্ঞান লুপ্ত হল

॥ পাঁচ ॥

রাত্রিকাল।

সমুদ্রের কাছাকাছি কোন অঞ্চল। গর্জন শুনে নলিনাক্ষ বুঝতে পারছিল।

একটা তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিল সে।

সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়েও আরো কিছু কিছু শব্দ কাণে আসছিল নলিনাক্ষর। মাঝে মাঝে অতিকায় সরীসৃপদের গুরুগম্ভীর ডাকে কেঁপে উঠছিল অন্ধকারের পর্দা। হিস্ হিস্ শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল অহরহ।

সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে তাল রেখে যন্ত্রণায় যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করছিল নলিনাক্ষর ক্ষতবিক্ষত বাঁ হাতটা।

ধীরে ধীরে চাঁদের আলোয় স্থানটা আলোকিত হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ দেখে, তারপায়ের কাছে বসে রয়েছে সেই ছেলেটি। সে ছাড়া সেখানে আরও তিনজন মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পারে নলিনাক্ষ। তাদের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে একটি করে নলযুক্ত সিলিণ্ডার—ছেলেটির হাতে আগে যেমনটি সে দেখেছিল। তাদের আরো কিছু কিছু সরঞ্জাম নলিনাক্ষর নজরে পড়ল অস্পষ্টভাবে। জিনিসগুলোকে কোন এক ধরনের অস্ত্র বলে মনে হল তার।

সিলিণ্ডার অস্ত্রটির শক্তি নলিনাক্ষ স্বচক্ষে দেখেছে। অমন যে একটা অতিকায় প্রাণী—চোখের পলক পড়তে না পড়তে তাকে নিঃশব্দে হাওয়ায় যেন মিলিয়ে দিলে। বোধ হয় পাহাড়ও উড়িয়ে দিতে পারে অস্ত্রটি!

কিন্তু এই মানুষগুলো—কারা?

নলিনাক্ষ ভাবতে সুরু করে। ক্রেটেসাস পর্যায়ে পৃথিবীতে

মানুষের অস্তিত্ব নেই। তাহলে—ওই ছেলেটিরই বা পরিচয় কী? এরা কি নলিনাক্ষর মতই সময়ের যাত্রী? হতে পারে।

নলিনাক্ষ এতক্ষণ শুয়ে ছিল। এবার উঠে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এগিয়ে এল তার কাছে। লোকটা প্রায় সাত ফিটের মত লম্বা। অদ্ভুত আকৃতির মাথায় সাদা চুল। ভাবলেশ হীন মুখে নলিনাক্ষর দিকে তাকাল সে। কী যেন বলল সেই ছেলেটির মত অপরিচিত ভাষায়।

ছেলেটিও উত্তর দিল বোধ হয়।

নলিনাক্ষর মনে হল, ছেলেটি খুবই যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

এবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল লোকটি।

ছেলেটি এগিয়ে এল। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল নলিনাক্ষকে।

ছেলেটির দৈহিক ক্ষমতা নলিনাক্ষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে তুলল। মনে হল, সে যেন ছেলেটির কাছে নিতান্তই একটা শিশু!

নলিনাক্ষকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল ছেলেটি। তারপর তাকে টানতে টানতে তাঁবুর দরজার কাছে নিয়ে গেল।

আর, ঠিক এই সময়ে হঠাৎ কী যেন একটা ঘটতে সুরু হয়ে গেল সেখানে। কোন একটা বস্তু এসে ধাক্কা খেল তাঁবুর গায়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাঁই করে বেরিয়ে গেল তাদের মাথার ওপর দিয়ে।

চাঁদের আলোয়, নলিনাক্ষ দেখতে পেল স্বন্ স্বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এল আবার একটা জিনিষ।

সেটা এসে পড়লো তাদের পায়ের কাছে।

নলিনাক্ষ দেখল, জিনিষটা তার মাথার মত গোলাকার এক ধাতব বল। কেমন যেন মনে হল নলিনাক্ষর। ডান হাত দিয়ে বলটাকে তুলে নিল সে। তারপর যে দিক থেকে সেটাকে আসতে দেখেছে, সেই দিক লক্ষ্য করে সেটা আবার ছুঁড়ে দিলে।

বোমার মত, সেটা থেকে কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। কেবল শূন্যে

পরই সঙ্গে সঙ্গে একটা সুতীব্র সাদা চোখ ঝল্‌সানো আলোর বিকিরণ পড়ল !

দূরে—অন্ধকারের ভেতর থেকে রাইফেলের কোন আওয়াজ শোনা গেল না। কিন্তু ওই ধরনের আলো, তাঁবুটাকে ঘিরে শূন্যে ফুটে উঠতে লাগল একটার পর একটা !

কোন বিস্ফোরণের শব্দ কানে আসছিল না নলিনাক্ষর। তবু যেন মনে হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে আঘাত করছে তাঁবুও ওপরে। স্বন্ স্বন্ শব্দের বিরাম নেই। তাঁবুর গায়ে আঘাত পেয়ে সাঁই সাঁই শব্দে যেগুলো ফিরে যাচ্ছে—নলিনাক্ষর মনে হল, সেগুলো বুলেট্‌ই !

কিন্তু তাঁবুটির কোন ক্ষতি হচ্ছে না ! রাইফেলের বুলেট্ যে তাঁবুর গায়ে লেগে ফিরে যায়, সে-তাঁবু কীসের তৈরী হতে পারে ?

নলিনাক্ষ ভেবে কূলকিনারা পেল না প্রথমে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য সে বুঝতে পারল। তাঁবুটির উপাদান ক্রমশঃ অদৃশ্যমান ! চোখে দেখা খুবই কঠিন। তার গায়ে আলো পড়লে, সেটা কিছু একটা করে, বিকৃত হয়—প্রতারকের মত কাজ করে নিজের আশ্রিত-দের প্রতি।

কিন্তু বুলেটের আঘাতে তাঁবুটির যে আদৌ ক্ষতি হয়নি, তা নয়। এখানে ওখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরের আলো ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল নলিনাক্ষ।

কিন্তু এই তাঁবুর দিকে লক্ষ্য করে কারা গুলী ছুঁড়ছে !

মুখোমুখি অবস্থান করছে কি দুই শত্রু শিবির ?

নলিনাক্ষর মনে হতে লাগল শত্রু তাদের লক্ষ্যকে স্থির রাখতে পারছে না কিন্তু রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে !

হঠাৎ সাঁই করে একটা বুলেট নলিনাক্ষর কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে ঝুঁকে পড়ল একপাশে। ডান হাতটা তার নিজের রাইফেলের ওপরে গিয়ে পড়ল। রাইফেলের সঙ্গে ছিল কারট্রিজ বেল্ট্‌টাও।

নলিনাক্ষ রাইফেলটাকে হাতে তুলে নিয়ে দেখল, সেটা গুলীভর্তিই রয়েছে।

অতঃপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। তাঁবুর দরজার কাছে অবরোধ-প্রাচীরের ওপর দিয়ে নলিনাক্ষ এবার উঁকি মারল।

তার গণ্ডদেশ স্পর্শ করে পাশের পাথরের বুকে গিয়ে আঘাত করল একটা উত্তপ্ত বুলেট!

তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার বেরিয়ে এল বালকটির মুখ থেকে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল বালকটি। পাথরে বাধা পেয়ে বুলেটটি ছিটকে গিয়ে আঘাত করেছে তার কোমলত্বকে!

তার একটা হাত থেকে রক্ত ঝরছে! অবস্থা দেখে নলিনাক্ষ ক্রোধে যেন অন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। গুলীভরা রাইফেলটাকে অবরোধ প্রাচীরের ওপরে স্থাপন করে কালিঢালা অন্ধকারের দিকে চেয়ে চোখ দুটো যেন তার ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলতে লাগল।

প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে জঙ্গলটা—একটা প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রাচীর যার ভেতর থেকে ছুটে আসছে ওই সব বুলেট্!

কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। তবু নলিনাক্ষ রাইফেল উঁচিয়ে সেই আঁধারের মধ্যে কোন কিছুর নড়াচড়া লক্ষ্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

হ্যাঁ, ওইতো। অন্ধকারটা যেন কিছু তরল, অস্থির···নলিনাক্ষর হাতের রাইফেল গর্জে উঠল সেদিকটা লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কাতর আর্তনাদ।

লক্ষ্যভেদ তাহলে হয়েছে। উল্লাসে উত্তেজনায় নলিনাক্ষর শরীরটা কাঁপতে থাকে।

তাঁবুর মধ্যেই একটি লোক ছেলেটির হাতের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা সুরু করে দিয়েছিল। আঘাত খুবই সামান্য। তবু সাবধান হওয়ার কারণ আছে। অজানা অচেনা কোন মারাত্মক রোগবীজাণু সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে।

তাঁবুর ভেতরের অপর লোক দু'টির মনের প্রতিক্রিয়া নলিনাক্ষ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারল না।

তারা সেই সিলিণ্ডার অস্ত্র হাতে নিয়ে নির্বিকারভাবে পুতুলের মত বসে ছিল।

॥ ছয় ॥

সূর্যের প্রথম আলোয় তাদের পেছনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পর নলিনাক্ষ পরিবেশটা বুঝতে পারল।

তাদের ছোট, তাঁবু-দুর্গটা পাহাড়ের একটা উঁচু জায়গায় অবস্থান করছে। এখান থেকে সমুদ্রটাকে দেখা যায়। পেছনে মালভূমি। লবণ বিলগুলো ঢুকে পড়েছে ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে। তাদের কিনারায় গভীর জঙ্গল। এবং সেই জঙ্গল বেষ্টিত এক বিলের কাছে অবস্থান করছে আশ্চর্য ধরনরে এক রকেট-যান!

এ ধরনের রকেট নলিনাক্ষ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেনি।

রকেটের আকৃতি চুরুটের মত। সামনে, পিছনে বাষ্পনিঃসারী নলের খোলা মুখ এবং এক সারি পোর্ট-হোল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সমুদ্র-জাহাজের মত বৃহদাকার। তবু সব কিছু মিলিয়ে রকেট-যানটির একটা বিশেষত্ব নলিনাক্ষর মনে চমক জাগাল।

এরা মহাশূন্য থেকে এসেছে—অন্য জাতের মানুষ তাহলে!

নলিনাক্ষ মনে মনে বলতে লাগল, অন্য কোন গ্রহের মানুষ এসে নেমেছে পৃথিবীতে! কখন? না, পৃথিবীতে যখন মানুষের অস্তিত্ব নেই। পরম আশ্চর্য ব্যাপার!

আর ভিন্‌গ্রহের মানুষগুলো দু'দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে বসেছে।

এই পর্যন্ত নলিনাক্ষ বুঝতে পারছে কিন্তু তাদের লড়াইয়ের কারণটা জানা যাবে কীভাবে? এদের ইঙ্গিত বা ভাষা—কোনটাই নলিনাক্ষর বোধগম্য হয় না।

দূরে—একটা বড় পাথরের দিকে নজর পড়ল নলিনাক্ষর। সেখানে একটা মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট কিন্তু একটাকে লক্ষ্য করে নলিনাক্ষ যে গুলী ছুঁড়েছিল এবং গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাতর আর্তনাদ ছুটে এসেছিল সেই দিক থেকে—মনে পড়ল সে কথা।

নলিনাক্ষ তাহলে ওই মানুষটাকেই আহত করেছিল তখন!

তাঁবু-দুর্গের ভেতর থেকে নলিনাক্ষ বেরিয়ে পড়ল। হাতের রাইফেলটা রেখে গেল তাঁবুর মধ্যে।

তাঁবুর বাইরে ওইভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে বেশ কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয়ই দিল সে। রাত্রির অন্ধকারে তাঁবুর মানুষ-গুলোকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে যে ভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বন্ স্বন্ করে উত্তপ্ত বুলেট্ ছুটে এসেছিল, এখন নিঃশব্দ থাকলেও, পুনরায় যে কোন মুহূর্তে যে গুলী বর্ষণ সুরু হয়ে যাবে না —এমন কথা কে বলতে পারে?

আর, তা' যদি হয়, নলিনাক্ষর দেহটা তাহলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!

তবু দুঃসাহসের ভর করে নলিনাক্ষ এগিয়ে গেল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডকে পাশ কাটিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গিয়ে হাজির হল সেই মানুষের দেহটার কাছে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনাক্ষর মনে হল—মানুষটা জীবিত। তবে দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে, বলা কঠিন।

নলিনাক্ষ তার সুস্থ ডান হাতটা আহত মানুষটির কাঁধের পাশে নিয়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলল।

একটা গুলী সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ প্রাচীরের পেছনের পাহাড় থেকে ছুটে এল। সেটা সাঁই করে বেরিয়ে গেল নলিনাক্ষর মাথার ওপর দিয়ে।

আহত দেহটাকে টেনে একটা শিলাখণ্ডের আড়ালে নিয়ে যাবার আগেই দ্বিতীয় গুলী এসে আঘাত করল মানুষটার বুকের একপাশে।

শিলাখণ্ডটির আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নলিনাক্ষ ভাবতে লাগল উভয় পক্ষের অগ্নিবর্ষণের মধ্যে ওই ছোট তাঁবু-দুর্গটা কতক্ষণ আর টিঁকে থাকতে পারবে। তাঁবুর দিক থেকে শুধু খানিকটা করে নীলাভ বাষ্পের ফুৎকার বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

সিলিণ্ডার-অস্ত্রের রেঞ্জটা খুবই কম। আর, সেটা বুঝতে পেরেই শত্রুপক্ষ এয়ারগান বা ওই জাতীয় কোন অস্ত্র থেকে বুলেট্ ছুঁড়ে যাচ্ছে অবিরামভাবে।

এক সময়ে নলিনাক্ষ হামাগুড়ি দিয়ে শিলাখণ্ডটির আড়ালে আশ্রয় নেবার জন্যে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

নলিনাক্ষকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে আসছে। সবই আসছে তার পিছন দিক থেকে। তাঁবুর ওপরে পাহাড় চূড়ো। গুলী সেখান থেকেই আসছে।

জঙ্গলে ঢুকে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে নলিনাক্ষ শত্রু-পক্ষকে দেখতে পেল।

লম্বা গিরিপৃষ্ঠের কিনারায় সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে তারা। তবে সংখ্যায় খুব বেশী নয়। ছেলেটি যে তাঁবুতে আছে, সেটার পশ্চাদ্‌ভাগ ওটা।

তাদের কোন কোন অস্ত্রও নলিনাক্ষর নজরে পড়ল। কিছু অস্ত্র মোটা নলের রাইফেলের মত দেখতে।

তারপরেই নলিনাক্ষ দেখল, গুলী বর্ষণ করতে করতে মন্থর গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে তারা। বালকটি এবং তার সঙ্গী-দের চাইতে তাদের গায়ের রঙ্ একটু কালো। মাথার চুল হল্‌দে। তামাটে রঙের কোন ধাতব বর্ম দিয়ে আবৃত তাদের দীর্ঘ দেহগুলো। উচ্চতায় একজন সাত ফিটের কম হবে না বোধ হয়।

নলিনাক্ষ মনে মনে হিসেব করতে লাগল—এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে যদি নীচু পাহাড়টা অতিক্রম করে যেতে পারে, তাহলে তার 'টাইম-মেশিনের' কাছে নিরাপদে পৌঁছতে পারবে।

ভিন্‌গ্রহের এই দুই শত্রুপক্ষের লড়াইয়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনা কেন?

কিন্তু—তবু সেই ছেলেটির কথা বার বার নলিনাক্ষর মনে জাগতে থাকে। তাকে এখানে ওইভাবে ফেলে যেতে মন চায় না! ছেলেটির জীবনের আশঙ্কার এখানে প্রতি মুহূর্তে।

হঠাৎ তার নিজের রাইফেলটির আওয়াজ কাণে এল নলিনাক্ষর। সে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ লুটিয়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। অন্যান্যরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আবার এগিয়ে চলল সেই তাঁবু লক্ষ্য করে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই ছিটকে পড়ল আরো দু'টি কালো মানুষের দেহ।

—সাবাস।

উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল নলিনাক্ষ। তাঁবু থেকে তারই রাইফেলটা বগল দাবা করে ছেলেটিই গুলী ছুঁড়ছে। আর, একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যে। বাহবা!

রোমাঞ্চ-পুলকিত দেহে নলিনাক্ষ গাছের আড়াল থেকে মাথাটা বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে একবার দেখে নিলে।

তার কাছ থেকে মাত্র শ'খানেক ফিট্ দূরে পড়ে রয়েছে একটা কালো মানুষ। তার বিদেশীয় রাইফেলটা একপাশে পড়ে আছে।

নলিনাক্ষ মাথাটা জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিল। বড় বড় গাছের নীচে লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সে এগিয়ে চলল সেই রাইফেলটিকে হস্তগত করার লোভে।

রাইফেলটার সঙ্গে ছিল বেল্ট্ কেস্ ও। সেই কেসভর্তি ধাতব জিনিষগুলো যে গুলী হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, নেড়েচেড়ে দেখে নলিনাক্ষ নিঃসন্দেহ হল সে বিষেয়ে।

শূন্যের দিকে লক্ষ্য করে নলিনাক্ষ সেই রাইফেলের টিপকলে চাপ দিয়ে দেখল।

হ্যাঁ, রাইফেলটা কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে। সেটাকে চালনা

করার যান্ত্রিক পদ্ধতিটা খুবই সহজ। টিপকলে নলিনাক্ষর আঙুলের চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিঃশব্দে একটা বুলেট মাথার ওপরে বৃক্ষশাখা পত্রাদি ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

নলিনাক্ষ আবার চেষ্টা করে দেখল। একটা শূন্য-খোল এসে পড়ল তার হাতে। সেটাকে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখল। নতুন বুলেট ভরে ছুঁড়তে হলে আগে একটা ঢাক্না খুলে রাইফেলের ভেতরটা খালি করে নিতে হয়। নলিনাক্ষ সহজেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সে আবার একটা তাজা গুলী ভরল তাতে। টিপকলে চাপ দিল। হিস্ করে বেরিয়ে গেল গুলীটা।

নলিনাক্ষ এবার তার পরবর্তী কাজের প্রোগ্রাম মনে মনে স্থির করে ফেলল। সে জানে যে, পূর্বদিক ঘুরে সমুদ্র বরাবর যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ওই গিরিপৃষ্ঠের ধারে লম্বা মানুষগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে। সেখান থেকে নলিনাক্ষ আচমকা আক্রমণ করতে পারবে তাদের। আর—সেই সঙ্গে তাঁবুর দিক থেকে সেই ছেলেটি তার সঙ্গীদের নিয়ে আক্রমণ জোরদার করে তুলবে তখন।

তবে, প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটা তত সহজ নয়।

বিদেশীয় রাইফেলটার ওজন প্রায় কুড়ি পাউণ্ডের মত। পর্বতারোহণে নলিনাক্ষর পটুতা নামমাত্র রয়েছে। উপরন্তু একটা হাত আপাততঃ খোঁড়া! সবদিক চিন্তা করে নলিনাক্ষ কিছুটা যেন মুষড়ে পড়ল।

তবু তার পরিকল্পনামত এগিয়ে চলল সে। এমন এক একটা স্থানে মাঝে মাঝে পা রাখতে হচ্ছে তাকে, যেটা সূঁচের মত সূক্ষ্ম এবং ধারালো। কোন কোন স্থান লাফিয়েও অতিক্রম করতে হচ্ছে।

গিরিপৃষ্ঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল দশটি দীর্ঘদেহী মানুষ। তাঁবুটা তাদের রেঞ্জের ভেতরেই রয়েছে। তবু, এখন গুলী বর্ষণ বন্ধ করে রেখেছে তারা।

নলিনাক্ষর সন্দেহ হল—তারা কিছুটা ধাঁধায় পড়েছে হয়তো। ওই তাঁবু-দুর্গের দিক থেকে তাদের লক্ষ্য করে কেউ গুলী ছুঁড়তে পারে, এ সম্ভাবনার কথা তাদের মনে স্থান পায়নি। কারণ, তাঁবুর ভেতরের মানুষগুলোর সিলিণ্ডার অস্ত্রের কথাই জানত তারা। কিন্তু এমন অস্ত্র তাঁবুর মানুষগুলোর হাতে কোথা থেকে এল, যার দ্বারা প্রাণ নিল তাদের তিনজন সঙ্গীর ?

নলিনাক্ষ তাদের পেছন থেকে গুটি গুটি পা পা করে একপাশে সরে গেল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। দৃষ্টি তাদের সেই তাঁবুর দিকে।

বিদেশীয় রাইফেলটাকে একটা শিলাখণ্ডের ওপরে রেখে—সারিবদ্ধ মানুষগুলোর পার্শ্বদেশ থেকে স্থির লক্ষ্যে নলিনাক্ষ গুলী ছুঁড়ল একটা। রাইফেলটার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। যেহেতু সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো—একপাশ থেকে গুলী ছুঁড়লে পাশাপাশি দু'তিনজন একসঙ্গে যে ঘায়েল হবে, নলিনাক্ষ বুঝতে পেরেছিল।

তার অনুমানে ভুল হয় নি।

গুলী ছোঁড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মানুষ শুয়ে পড়ল সেখানে। তাদের পাশের আরো দু'জন লাফালাফি করতে সুরু করল। এবং বাকী মানুষগুলো ইতস্তত দৌড় লাগাল প্রাণের ভয়ে!

নলিনাক্ষর রাইফেলটাকে হাতে নিয়ে তাঁবুর ভেতর থেকে ছেলেটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তার পিছনে সিলিণ্ডার অস্ত্রধারী তার সঙ্গী দু'জন।

ভিন্‌গ্রহের দু'জন মানুষের লড়াই আপাততঃ এখানেই খতম!

পাহাড়ের গা বেয়ে নলিনাক্ষ নেমে এল ধীরে ধীরে।

তার সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে ছেলেটিও এগিয়ে এল। মিষ্টি সুরে অপরিচিত ভাষায় ছেলেটি কী যেন বলল নলিনাক্ষকে। নলিনাক্ষর রাইফেলটা সে ফেরৎ দিল।

বালকটির শরীরে যে চকচকে উজ্জ্বল ধাতব পোষাক ছিল, নলিনাক্ষর ইচ্ছা হল, সেটাতে একবার হাত দিয়ে দেখে।

হাত বাড়িয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 'পপাত ধরণীতলে!'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মাথা নত করল নলিনাক্ষ।

বালকটির দু'চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কিন্তু তারপরেই, সে কী বুঝল, কে জানে! নলিনাক্ষ'র মনে হল, ছেলেটির ঠোঁটে যেন অস্পষ্ট একটা হাসির আভা ফুটে উঠেছে।

সে কৌতুকবোধ করল নাকি?

॥ সাত ॥

তারা একসঙ্গে পাহাড় থেকে নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল।

যে-বিদেশীয় রাইফেলটি নলিনাক্ষ হস্তগত করেছিল, সেটা ছেলেটির হাতে তুলে দিয়েছিল সে। ছেলেটি যত্নের সঙ্গে অস্ত্রটি পরীক্ষা করছিল।

তার সঙ্গের মানুষগুলো মৃত কালো মানুষগুলোর দেহ তল্লাসী করে আরও কয়েকটা রাইফেল হস্তগত করেছিল আগেই।

সমুদ্রকূলে প্রকাণ্ড রকেটের ছায়ায় এসে দাঁড়াল সকলে।

তারপর মানুষগুলো তাঁবুসমেত সমস্ত সাজসরঞ্জাম এনে রকেট-যানটির মধ্যে সাজিয়ে রাখতে লাগল। ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগল নলিনাক্ষ।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে নলিনাক্ষর নিজের কথা মনে পড়ে গেল। সে কে এবং কেন এখানে এসেছে? এই ভিন্‌গ্রহের মানুষগুলির কলহের মধ্যে নিতান্ত আকস্মিকভাবে এসে পড়ে এদের কিছুটা সাহায্য করা এক কথা—আর, এদের সঙ্গে এদের দেশে ফিরে যাওয়া (ঈশ্বর জানেন, কোন্ গ্রহে) সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

'এবার আমাকে তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে', ছেলেটির একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে নলিনাক্ষ বলে। যদিও সে জানে, তার কথা এরা বোঝে না।

ছেলেটির ভ্রূকুঞ্চিত হল। সে তার নিজের ভাষায় কিছু বলল যেন নলিনাক্ষর উদ্দেশ্যেই।

নলিনাক্ষ তার বক্তব্য ছেলেটিকে কীভাবে বোঝাবে— ক্ষণকাল চিন্তা করে নিল মনে মনে। তারপর নিজেকে দেখিয়ে, পূর্বদিকে— যেখানে তার 'টাইম মেশিন'টা অবস্থান করছে, সেই দিকটা হাত তুলে দেখাল সে।

অতঃপর নলিনাক্ষ তার 'টাইমমেশিন'টার দিকে পা বাড়াল।

ছেলেটির গলা থেকে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার বেরিয়ে এল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নলিনাক্ষর ওপরে।

ঘটনার আকস্মিকতায় নলিনাক্ষ প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্ময়-বিমূঢ় এবং পরক্ষণেই তার হাতের রাইফেল লাঠির মত এসে আঘাত করল একটি মানুষকে। মানুষটা সেখানেই শুয়ে পড়ল। অপর মানুষ দু'টো দ্বিতীয়বার আক্রমণের উদ্যোগ করার আগেই নলিনাক্ষ শক্ত হাতে ছেলেটিকে টেনে নিল নিজের কাছে।

নলিনাক্ষর দিকে সিলিণ্ডার-অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল তারা।

'অস্ত্র নামাও।' সে কঠিন গলায় বলল, 'তা' নাহলে ছেলেটির ঘাড় ভেঙে দেব আমি। নামাও অস্ত্র।'

কথার অর্থ না বুঝলেও, নলিনাক্ষ'র গলার স্বর বোধহয় চিনতে পারল তারা, ধীরে ধীরে অস্ত্র নামিয়ে ফেলল।

নলিনাক্ষ ছেলেটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। রাইফেলে'র নল তার কোমরের ওপরে ঠেকিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।'

ছেলেটি অপরাধীর মত এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে

চলল নলিনাক্ষ। কিছুদূর যাওয়ার পর সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল,—রকেট-যানটি আর দৃষ্টিগোচর হল না তার।

মাথার ওপরে সহসা এক প্রবল গর্জন শুনল নলিনাক্ষ। সে ওপর দিকে তাকাল। দেখল, রকেট-যানটা শূন্যে ভেসে পড়েছে।

কিন্তু ও কী?

আতঙ্কে নলিনাক্ষর আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। রকেট-যানটা তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে তীব্রগতিতে নেমে আসছে শূন্য থেকে!

ভয় পাওয়া খরগোসের মত ছেলেটি দৌড়ল পাহাড়ের এক গহ্বর লক্ষ্য করে। রকেট থেকে ভায়োলেট্ রঙের এক সুতীব্র রশ্মি এসে পড়ল একস্থানে। ছেলেটি তার আগেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

তার পাশে আর একটা গহ্বরে তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিল নলিনাক্ষও।

ভায়োলেট্ রশ্মিটা তারপর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে রকেটের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটি পর্বতগহ্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষও বেরিয়ে পড়ল। তার জখম হওয়া বাঁহাতটা এবার নিদারুণ যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল। দু'পায়ের ওপরে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার চারদিকে পাহাড় জঙ্গল, বিল—সবকিছু যেন একটা প্রবল ভূমিকম্পের ধাক্কায় কোথায় কোন্ অতল অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে!

আর, তখনই একটা ছোট হাতের মিষ্টি পরশ নলিনাক্ষ তার সর্ব অঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

॥ আট ॥

তারপর নলিনাক্ষ অনেক চিন্তা করেছিল।

তার মনের সব প্রশ্নের উত্তর সে না পেলেও, এমন কতকগুলো ঘটনা'র রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, যা' থেকে নলিনাক্ষ

ঝুঝতে পেরেছিল যে, আগাগোড়া ব্যাপারটা মোটেই দুঃস্বপ্ন নয়।

প্রথম, বালকটি স্বয়ং। তারপর সেই রকেটযান এবং বিজ্ঞানের প্রতি নলিনাক্ষ'র অটুট আস্থা প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে, মানুষগুলো অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছে। ছেলেটির অস্বাভাবিক দৈহিকশক্তির রহস্য এই হতে পারে—সে পৃথিবীর চেয়ে কোন বড় গ্রহ বিংবা নক্ষত্র থেকে এসেছে।

একই, অথবা ভিন্নগ্রহের দুই জাতির মানুষ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল। তাদের লড়াইয়ের কারণ রাজনীতি হতে পারে, কিংবা জাতিগত কোন বিরোধ—এমনকি ধর্ম-সম্বন্ধীয় হওয়াও বিচিত্র নয়!

ছেলেটিকে তার দেহরক্ষীসহ এই শূন্য-গ্রহে আত্মগোপন করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হয়তো। সিংহাসনচ্যুত কোন রাজপুত্র, বা কোন রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ দাবীদারও হতে পারে সে। সেই কালো লম্বা মানুষগুলো ছেলেটির সন্ধানে এখানে হয়তো এসে পড়েছিল! তারা ছেলেটিকে বন্দী করে নিয়ে যেতই—যদি না ঘটনাস্থলে আকস্মিকভাবে আবির্ভাব ঘটত নলিনাক্ষর।

এ পর্যন্ত অনুমান করে নিতে নলিনাক্ষর অসুবিধা হল না। কিন্তু এর পরেই জটিলতা আসছে। নলিনাক্ষ যখন ডাইনোসরের শিকার হয়ে পড়েছিল, তখন ছেলেটি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে উদ্ধার করেছিল তাকে। তারপর নলিনাক্ষকে বালকটি তাদের তাঁবুতে নিয়ে গেছে। একটা অলৌকিক সবুজ মলম দিয়ে তার ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়া হাত-টাকে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। তারপর বেঁধেছে সেই খণ্ডযুদ্ধ। তাদের জন্যে নলিনাক্ষর যা' করা উচিত ছিল, নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সে সময়ে তা' সম্পন্ন করেছে বৈকি।

নলিনাক্ষ তাদের দলের কেউ নয়। হতেও চায় নি। কাজেই, যখন তারা তাদের আপন গ্রহে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করল, নলিনাক্ষ সরে দাঁড়াল।

কিন্তু ছেলেটি তখন তাদের নিজস্ব ভাষায় চীৎকার করে কী যেন বোঝাল তার সঙ্গীদের। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নলিনাক্ষর ঘাড়ে। তার অর্থ নলিনাক্ষর মনে হল, ছেলেটি তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি। নলিনাক্ষকে কি তার এতই ভাল লেগেছে? নাকি উদ্দেশ্য অন্য? নলিনাক্ষর মত একজন যুদ্ধকুশলী মানুষকে হাত-ছাড়া করতে চায় নি তারা?

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, নলিনাক্ষ তারপর যখন ছেলেটিকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিক থেকে কোন রকম জোরালো বাধা এল না। রকেট যানে চেপে পালিয়ে যাবার সময়ে একটা সুতীব্র ভায়োলেট্ রশ্মি দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল মাত্র কয়েকবার।

তাহলে রকেটের মধ্যে এমন কেউ একজন ছিল, যার আদেশেই ছেলেটিকে হত্যা করার ওই চেষ্টা। কে সে? দলের কোন বিশ্বাসঘাতক?

অন্ধকার একটা গহ্বরের মধ্যে নলিনাক্ষর চেতনা ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

একখানা ক্ষুদ্র হাত সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষর ডানহাতটা চেপে ধরল শক্ত মুঠিতে!

—কে?

নলিনাক্ষর দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করতে পারল না। তবে অনুমানে বুঝতে পারল। সেই ছেলেটি।

নলিনাক্ষর হাতে টান পড়ল। টানের দিকে এগিয়ে চলল সে। অন্ধ মানুষকে যেন কেউ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

নলিনাক্ষ অবাক হল! অন্ধকারও কি ছেলেটি স্পষ্ট দেখতে পায়? অথবা, বিস্ময়কর কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পথ চিনে চলতে সক্ষম সে?

অবশেষে আলোর দেখা পাওয়া গেল।

আনন্দে প্রায় নাচতে ইচ্ছা হল নলিনাক্ষর। গহ্বর থেকে বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠল। কয়েক ঘণ্টা আগে সে এই স্থান থেকেই গিরিশীর্ষে ওঠা সুরু করেছিল। বন্ধ্যা-সমতল ভূমিতে শুষ্ক জলনালীর চিহ্ন। সারি সারি জলাভূমি এবং জঙ্গল। শৈলশ্রেণীর ওপর সমুদ্রঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ওই, দূরে—অবস্থান করছে তার টাইম মেশিনটা। ওখানে আছে নিরাপত্তা—বাড়ি, ল্যাবরেটরী · নলিনাক্ষর, একান্ত নলিনাক্ষরই!

নলিনাক্ষ কী ভাবছে, ছেলেটি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। সে নলিনাক্ষর হাতের ওপরে একটা হাত রাখল। যেন মৃদু হাসল তার মুখের দিকে চেয়ে। তার পরেই নলিনাক্ষর চোখে যে-বেদনা ফুটে উঠেছিল, সেটা অনুভব করল বুঝি সে। নলিনাক্ষর বাঁ হাতখানার ওপরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল বার কয়েক। নিজের শরীর থেকে একগুচ্ছ পাতলা ধাতব বস্তু বার করে বাঁ হাতে জড়িয়ে দিল নলিনাক্ষর। তার আগে সবুজ রঙের একটা মলম লাগিয়ে দিয়ে ছিল অবশ্য ক্ষতস্থানে।

সূর্যের আলো যেন অগ্নিবর্ষণ করছিল তাদের দুজনের ওপর।

তারা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গেল টাইম মেশিনটাকে লক্ষ্য করে।

ছেলেটিকে যেন খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তখন!

॥ নয় ॥

টাইম মেশিনের পাশে নলিনাক্ষ এবং ছেলেটি নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল।

মেশিনে মাত্র একজনেরই স্থান হতে পারে। দু'জন মানুষকে বহন করারও শক্তি নেই নলিনাক্ষর টাইম মেশিনে!

—তাহলে ?

শুধু ছেলেটি যদি এই মেশিনে চেপে যাত্রা করে, তাহলে তার নিজের গ্রহ থেকে সুদূরে অবস্থিত অন্য একটি নতুন গ্রহে গিয়ে পৌঁছবে সে। সেখানে তাকে কেউ বুঝতে পারবে না, কিংবা সে নিজেও সেখানকার অধিবাসীদের কোন কথা বোঝাতে সক্ষম হবে না। অতএব সেখানে গিয়ে ছেলেটি হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এবং অসহায়।

যদি নলিনাক্ষ ফিরে যায়, তাহলেও এই ক্রেটেসাস যুগের জঙ্গলের মধ্যে ছেলেটিকে একাকী ফেলে রেখে যেতে হবে। খাবার নেই। শত্রু বা হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাবার নেই কোন বিশ্বাসযোগ্য উপায়।

ছেলেটি নলিনাক্ষর পিঠে একটা হাত রাখল। টাইম মেশিনের উন্মুক্ত দরজার দিকে আস্তে ঠেলে দিল নলিনাক্ষকে।

কাছেই, নলিনাক্ষ কিসের পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

সেখানে আবির্ভূত হয়েছে একটা ছোট ডাইনোসর। একটা পাখী রয়েছে সেটার মুখে।

একটা শব্দ করল নলিনাক্ষ। বাচ্চা ডাইনোসরটাকে ভয় দেখাল।

মুখের শিকার ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিল ডাইনোসরটা।

পাখীটাকে নলিনাক্ষ তুলে নিলে। ভবিষ্যতে তার কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করানোর জন্যে ওটাকে দরকার হবে।

তারপর সে মেশিনের মধ্যে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল। এবং তারপর—

টাইম মেশিনের দরজাটা যখন আবার খুলল, তখন ষাট্‌লক্ষ বছর পরে—তার ল্যাবরেটরীর কন্‌ক্রিট্‌ মেঝেতে পদার্পণ করল নলিনাক্ষ রায়।

জেনারেটরের সাহায্যে টাইম মেশিনের ব্যাটারীগুলোর শক্তি পুনরুজ্জীবিত করে তোলার ব্যবস্থা করে নলিনাক্ষ দেখা করতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে।...

* *
*

'দশ মিনিটের মধ্যে আমি আবার চলে যাচ্ছি'—ব্যাণ্ডেজ করা হাত-টার দিকে তাকিয়ে নলিনাক্ষ অস্থির গলায় বলল, 'ব্যাটারীগুলো চার্জ করা হয়ে গেছে। এবার তোমার সাহায্য চাই, প্রফেসর।'

'কী সাহায্য আমি করতে পারি?' আমি বললাম, 'আমি মেকানিক্ নই। কিংবা তোমার হাতের চিকিৎসা করার মত বিদ্যেও জানা নেই আমার।'

নলিনাক্ষ বলল, 'আমার এই টাইম মেশিনে করে ছেলেটিকে আমি পাঠিয়ে দেব এখানে। কী ভাবে এটাকে চার্জ করা হয়, তোমাকে আমি দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। খুব সহজ। চার্জ হয়ে গেলে শূন্য মেশিনটাকে আমার জন্যে আবার পাঠিয়ে দেবে তুমি। যদি কোন কারণে আমার ফিরে আসতে দেরী হয়, তাহলে ছেলেটির যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় তুমি দেখো প্রফেসর।'

প্রতিটি যন্ত্রপাতি, তাদের কার্যক্রম—নলিনাক্ষ আমাকে যেমনটি দেখাল, অতি যত্নের সঙ্গে সতর্কভাবে আমি সবকিছু একে একে লক্ষ্য করে গেলাম।

তারপর, সেই অত্যাশ্চর্য পাখীটাকে নলিনাক্ষ আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চার ঘণ্টা পরে—আমি লক্ষ্য করলাম, টাইম মেশিনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

একটা বিশ্রী গোঁ গোঁ গর্জন সুরু করে দিলো জেনারেটরগুলো। অতবড় মেশিনটাকে একটা কালো ধামের মধ্যে যেন ভরে ফেলল

কেউ। আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সেই কালো খামটাও কোন্ অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল আবার!

ঘরখানা শূন্য!

জেনারেটরগুলোকে থামাবার জন্যে সুইচে হাত রাখলাম।...

নলিনাক্ষর টাইম মেশিনটা আর ফিরে আসেনি। আমি অনেক দিন সেখানে অপেক্ষা করে ছিলাম। অবশেষে চলে আসি।

আমি বিজ্ঞানী নলিনাক্ষ রায়ের গল্প বলেছি। আগে আমার নিজের কথাও। কিন্তু আমিও প্রথমে যে ভাবে নলিনাক্ষর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, যারা শুনল, তারাও সেসব কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারল না।...

এ বৎসর খনন-কার্য চালাবার জন্যে সরকারী অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। আমি এখনও মিউজিয়মের সিনিয়র প্রত্নতাত্ত্বিক। পৃথিবীর প্রাচীন জীবজন্তুবিষয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞও—পেলিওনটোলজিষ্ট্। গত বছরের অসমাপ্ত কাজটা এ বছর প্রথমেই শেষ করার মনস্থ করলাম।

ক্রেটেসাস সমুদ্রতীরের সন্ধান যেখানে পাওয়া যাচ্ছে, সেই জায়গার ওপরে বিজ্ঞানী নলিনাক্ষ রায়ের এষ্টেট্ রয়েছে। কাজেই, তার এস্টেটের অছিদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হল।

ষাট লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীর বুকে পৌঁছে নলিনাক্ষ যেসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল, সেই ধরণের ছবির একটা বই রয়েছে আমার কাছে। তা' ছাড়া, তার কথা শুনে একটা খামের পিঠে কতকগুলো পেন্সিল স্কেচ্ও করেছিলাম আমি।

সমুদ্রতটের একটা অংশ অনাবৃত করেছি আমরা। এখানকার প্রস্তরীভূত বালির ওপরে অতীতের প্রতিটি চিহ্ন এত সুস্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে, দেখে মনে হয় যেন অল্প কিছুদিন আগেকার চিহ্ন এসব।

ভাটার সময়ের ছোট ছোট তরঙ্গচিত্র—অগভীর জলে সামুদ্রিক কীটের বুকে হেঁটে যাওয়ার দাগ! ছোট ছোট সরীসৃপদের পায়ের ছাপও রয়েছে।

ক্রেটেসাস সমুদ্রতীরের ভিজে বালির বুকে দু'জন মানুষের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম আমি। পাশাপাশি চলে গেছে। যে চল্লিশ ফিট্ বালুপ্রস্তর অনাবৃত করেছি আমরা, তার ওপর দিয়েই অতিক্রম করে গেছে পদচিহ্নগুলো। তারপর সমুদ্রের গভীরতার দিকে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! পদচিহ্নগুলো একমাপের নয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সঙ্গে ছিল একটি কিশোর বালক।

বালির ওপরে এমন আরও কিছু পদচিহ্ন রয়েছে, যেগুলো কোন বিশাল পাখীর চওড়া তিন আঙুলে পায়ের ছাপ বলেই সন্দেহ হয়! কিন্তু সে-গুলোর ওপর দিয়ে ষাট লক্ষ বছর অতীতের টাইরানো-সরাসদের পায়ের চিহ্নও রয়েছে অঙ্কিত।

পূর্ণবয়স্ক মানুষটির সঙ্গে বালকটিও যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একস্থানে। পদচিহ্নের প্রকৃতি দেখে তাই মনে হচ্ছে। তাদের সেই পদচিহ্নের ওপরে একটা অতিকায় প্রাণীর থাবার চিহ্ন! সমুদ্রতটের কাছে গিয়ে সেচিহ্নও বিলীন!

সেই সঙ্গে আর একটা জিনিষ উল্লেখযোগ্য।

যেখানে পদচিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, বালুবেলা সমতল যেখানে—সেখানে আর একটা বিস্ময়কর চিহ্ন বর্তমান। বালুরাশি সেখানে যেন অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল।.....

দু'বছর আগে নলিনাক্ষর ল্যাবরেটরীতে নলিনাক্ষকে তার আবিষ্কৃত টাইম মেশিনে চেপে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম আমি। সে আর ফিরে আসেনি। ক্রেটেসাস সমুদ্রতীরে বালির বুকের যেসব পদচিহ্নের বিবরণ দিলাম, সেগুলো আমার পাশে থেকে আমার লোকজনেরাই শুধু দেখেছে।

প্রস্তরীভূত চিহ্নগুলো তাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্টবোধ হওয়ায়, তারা কোনটাকে মানুষের পায়ের ছাপ বলে মনে করতে পারেনি। তারা শুধু জানে,—আমি তাদের বলেছিলাম—ষাট লক্ষ বছরের আগের পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল না।

বিজ্ঞান বলে,—এবং বিজ্ঞান কি সর্বদা ঠিক কথা বলে না?—যে, সময়ের বালুচরে ক্রেটেসাস যুগের অতিকায় প্রাণী ডাইনোসরদের পদচিহ্নই ফসিল হয়ে বিরাজ করছে মাত্র। *

* P. Schuyler Miller-এর "The Sands of Time" অনুসরণে

পড়লেও চলে, না পড়লেও চলে, এমন পত্রিকা নয়…

মডার্ন সাহিত্যের এমন একখানি প্রেসটিক ম্যাগাজিন যা না পড়লে সর্বাধুনিক কালচার এবং সামনের যুগের বিস্ময়কর বিবর্তনের ধারণা থেকে আপনি কম-সে-কম বিশ বছর পিছিয়ে থাকবেন! প্রতি সংখ্যায় থাকে চমকপ্রদ উপন্যাস আর অবাক-লাগানো গল্পকল্পের রাশি। আর থাকে একটি বিশেষ বিস্ময়কর ছায়াছবির জগতে প্রবেশের অধিকার…অভূতপূর্ব একটি সিনে ক্লাবের সদস্য হয়ে যেতে পারেন, যার সভাপতি সত্যজিৎ রায় ('আশ্চর্য!' পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ইনি)। সগৌরবে পঞ্চম বর্ষ চলছে!

বারোটি	সংখ্যার	চাঁদা	১৮ টাকা
চব্বিশটি	,,	,,	২৭ টাকা (৫% বাঁচে)
ছত্রিশটি	,,	,,	৩৮ টাকা (৫০% বাঁচে)
ষাটটি	,,	,,	৫৪ টাকা (৪০% বাঁচে)

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্

ভারতে মনোরম গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্থা

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪। ফোন: ৩৪-৭২৭৪

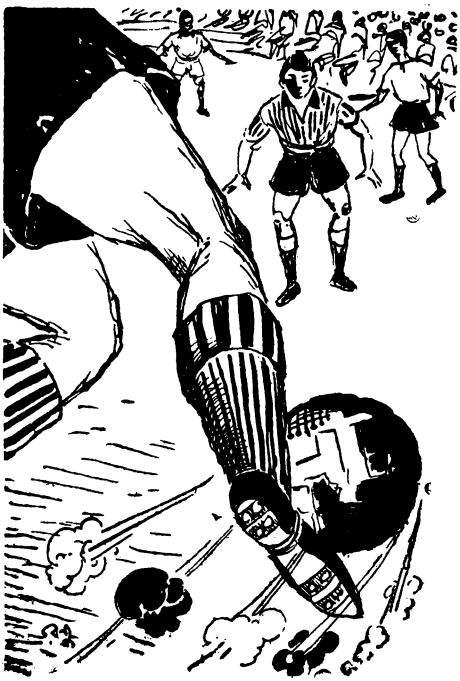

সেই আশ্চর্য পা

অর্ণব সেন

ছবি এঁকেছেন : রেণু প্রধান

এও কি সম্ভব ? হ্যাঁ, সম্ভব। আর সেই অসম্ভব সম্ভব হলো ডক্টর মুখার্জির ক্লিনিকে। ডক্টর মুখার্জি—সার্জারির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। মোটা সেলের চশমা, প্রায় প্রৌঢ়, কেশবিরল মস্তক, ফর্সা গায়ের রঙ। খুব বেশি লম্বা নয়, তবু বলিষ্ঠ গঠন দেহ। তিনিই এই অসম্ভব সম্ভব করলেন। এর আগেও তিনি আরও অদ্ভুত বিচিত্র দক্ষতা দেখিয়েছেন সার্জারিতে, কিন্তু এবার সবকিছুকেই ছাড়িয়ে গেল তাঁর বর্তমান প্রয়াস। সার্জারি, বিশেষ করে প্লাসটিক সার্জারি সম্পর্কে যে সব তথ্য এতদিন জানা ছিল, যা মানুষ এতদিন দেখেছে,—সব ধারণাই ওলটপালট হয়ে গেল।

সত্যিই, এমনি করেই যুগান্তর আসে। এক যুগের চিন্তাধারা, জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি অন্য যুগে হঠাৎ একটা আবিষ্কারের ফলে একেবারে ওলটপালট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। ভিয়েনা, লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, টোকিও—সর্বত্রই সাড়া পড়ে গেল। এমন কি মস্কো, পিকিংও বাদ গেল না। দেশবিদেশ থেকে অজস্র অভিনন্দন এল ডক্টর মুখার্জির কাছে। ফটো বেরলো কাগজে কাগজে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নিরঞ্জন ও ডক্টর মুখার্জির ফটো বেরলো। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেলায় ডক্টর মুখার্জি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর হাসপাতালের রোগী এবং ডাক্তাররাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নিরঞ্জনও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

তবু সবকিছুই একদিন শান্ত স্তিমিত হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। সময়ের ব্যবধানে উত্তেজনা, আগ্রহ, কৌতূহল একদিন ঝিমিয়ে পড়ল। নিরঞ্জন যখন আবার সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যথারীতি বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, যাতায়াত শুরু করল, নিয়মিত দশটা-পাঁচটা অফিস যেতে লাগল, তখন উত্তেজনার অবসান ঘটল। তবু কখনও কেউ কেউ অনিবার্য কৌতূহলবশে প্রশ্ন করত, 'আপনিই নিরঞ্জন মজুমদার? আপনারই ডান পাটা সম্পূর্ণ অন্য একজনের পা কেটে জুড়ে দেওয়া? আশ্চর্য, অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন ডক্টর মুখার্জি!'

উত্তর না দিয়ে নিরঞ্জন এখন শুধু মৃদু হাসে। সুন্দরী মেয়েরা, ছোট্ট সুন্দর বাচ্চারা অবাক হয়ে যখন তার দিকে, তার পায়ের দিকে চেয়ে থাকে, তখনও নিরঞ্জন উদাসীন হওয়ার চেষ্টা করে। তবে এখন আর এই পুরনো বিষয়টা নিয়ে সে তেমন আগ্রহ দেখায় না। সে জানে ডক্টর মুখার্জি তাকে নিয়ে যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমন ইতিহাস আরও অনেক রচিত হবে অদূর ভবিষ্যতে। তাছাড়া ডক্টর মুখার্জি আরও নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুযোগ তাঁর কাছে সর্বদাই প্রস্তুত। নিরঞ্জন হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই ওই

দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর আর কিছুই মনে নেই তার, শুধু একটা অবিশ্বাস্য যন্ত্রণার স্মৃতি ছাড়া।

তারপর কবে কতদিন পরে তার জ্ঞান হয়েছে! ওষুধের গন্ধভরা হাসপাতালের কেবিনের মধ্যে আচ্ছন্ন চেতনায় সে শুনেছে ডাক্তার ও নার্সদের ফিস্ ফিস্ কথাবলার শব্দ। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখেছে মাথার ওপর অনেক উঁচুতে ছাদ, মৃদু শব্দে ফ্যান ঘুরছে। জেনেছে তার ডান পাটা কাটা পড়েছে ট্রেনে। একথা জেনে সে শোকে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, আবার এটুকু ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে সে প্রাণে মরেনি। তবে শুনেছে ডক্টর মুখার্জি একটা যুগান্তকারী এক্সপেরিমেণ্ট করবেন তার এই কাটা পায়ের ওপর। সে সানন্দে রাজি হয়েছে।

ডক্টর মুখার্জির সেই যুগান্তকারী এক্সপেরিমেণ্ট সার্থক হয়েছে। একদিনে নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অবশ্য সেজন্য তাকে বার বার নিয়ে যাওয়া হয়েছে অপারেশন থিয়েটারে, শুয়ে থাকতে হয়েছে মাসের পর মাস। মৃত্যুর পর মুহূর্তে একটা পা কেটে নিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে তার দেহে। যে লোকটার পা কেটে জোড়া দেওয়া হয়েছে, তাকে সে দেখেনি। সে সম্পর্কে তার কাছে কিছু বলা হয়নি। ডক্টর মুখার্জির একটা বৈশিষ্ট্য হলো—অনেক তথ্য তিনি গোপন রাখতেই ভালোবাসেন। জিজ্ঞেস করলেও মৃদু হাসেন। লোকটাকে নিরঞ্জন দেখেনি, কিন্তু তার একটা পা সে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছে, তার অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে লোকটার একটা পায়ের অনুভূতি। কি আশ্চর্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার কলাকৌশল! এ কি কেউ ভাবতে পারত একশো বছর আগে?

* * *

ছুটির দিন নির্জন দুপুরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল নিরঞ্জন। সে ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। টিক্‌টিক্ শব্দে টেবিলঘড়ি চলেছে। হঠাৎ নিরঞ্জনের ডান পাটা শির শির করে উঠল। সে অনুভব করল,

কে যেন তার ডান পায়ের ওপর হাত রাখল। সে লাফ দিয়ে উঠে বসল। এমন আশ্চর্য অনুভূতির পরিচয় সে কখনও কোনদিন পায়নি। সে ভাবল, হয়ত এটা কোন নার্ভের জটিলতা। দীর্ঘকালের চেষ্টায় যে পাটা তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, সেই পায়ে এমন কোন নার্ভের জটিলতা দেখা দিলেও দিতে পারে তা সে স্বাভাবিক বুদ্ধিতেও ধরে নিয়েছিল। তাই সে দাঁড়াল মেজের ওপর। ডান এবং বাঁ—দুটো পা পাশাপাশি! বাঁ পায়ের তুলনায় ডান পাটা একটু কালো। হয়ত একটু বেশি মোটা, ভারি। তা, হয়ত চোখের ভুল। সে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়! তার একটু ঘুম আসছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল তার পায়ের ওপর কে যেন হাত রেখেছে। ঠাণ্ডা শীতল পাঁচ আঙুলের স্পর্শ সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। সে লাফ দিয়ে উঠে বসল। কেউ নেই ঘরে, ভয়ে সে চিৎকার করে উঠল। একটু দূরে পাশের ঘরে মিলি, তার ছোট বোন চিঠি লিখছিল টেবিলের কাছে বসে।

চিৎকার শুনেই মিলি তাড়াতাড়ি ছুটে এল এ ঘরে।

'কি হয়েছে দাদা?'

'এ ঘরে কে এসেছিল?' জানতে চাইল নিরঞ্জন।

'কে আবার আসবে! মা তো ঘুমোচ্ছে নিচের ঘরে। বাবা বাড়ি নেই। আর কে আসবে?'

'তাইতো, আচ্ছা তুই যা।'

মিলি হাসল। তার সুন্দর ঝক্‌ঝকে সাজানো দাঁত স্পষ্ট হলো। সে ভাবল, তার দাদা দুপুরবেলা স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করেছে। তার মজা লাগল তার দাদার ভয়ের কথা ভেবে। এ ঘটনা চিঠিতে লিখে জানাবে ইন্দ্রনীলকে। ইন্দ্রনীলও হাসবে তার দাদার অহেতুক ভয়ের কথা জেনে। মিলি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিলি চলে যেতে নিরঞ্জন ভাবল, এ হয়ত তার মনের ভুল। কিংবা এটা কোন নার্ভের অসুখ। তার ডান পায়ের নার্ভগুলো এখনো

স্বাভাবিকভাবে তার দেহের সামঞ্জস্য অর্জন করতে পারেনি বোধহয়।

* * *

প্রায় এক বছর হতে চলল সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, নাহলে এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অথবা কাঠের পায়ে ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হতো। বড় জোর কৃত্রিম পা লাগানো হতো। কিন্তু একেবারে আসল জীবন্ত পা—কেউ ধারণা করতে পারত গত শতাব্দীতে? বরং এমন কথা গল্প শুনলেও হাসত। ডাক্তাররাও তখন ভাবতে পারতেন না এমন ঘটনা। অথচ নিরঞ্জন আজ সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। চলাফেরা, ছুটোছুটি, লাফানো, কোন কিছুতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। অফিসে বসে বসেই ভাবছিল নিরঞ্জন। হঠাৎ তার ডাক পড়ল বড় সাহেবের ঘরে।

নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখুনি রওনা হলো বড় সাহেবের ঘরের দিকে।

'বোসো, দরকারী কথা আছে।' দত্ত সাহেব চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। 'তোমাকে খেলতে হবে কাল অফিস টিমে। তুমি নিশ্চয় আপত্তি করবে না? কলকাতার মাঠে আমাদের টিম এই প্রথম যাচ্ছে।' এয়ার কণ্ডিসন্ড ঘরের স্তব্ধ শীতলতায় দত্ত সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো।

'আমি খেলব?' ভয়ে ভয়ে বলল নিরঞ্জন।

'তুমি খেলোয়াড় ছিলে। ভালো ফুটবল খেলতে'

'কিন্তু আমার একটা পা যে—।'

'কোন অসুবিধে আছে? তাহলে বরং'—চিন্তিত হয়ে পড়লেন দত্ত সাহেব।

'না, আমিই খেলব।' হঠাৎ যেন জেদের বশে বলে বসল নিরঞ্জন। তাছাড়া সে তো সম্পূর্ণ সুস্থ, নিরঞ্জন ভেবে দেখল, না খেলাটা নির্বুদ্ধিতা। এই সুযোগ আর-নাও আসতে পারে। এক সময় সে তো ভালোই খেলত ফুটবল।

গভীর রাত্রিতে সে শুয়ে ছিল। তখন চাঁদডোবা অন্ধকার। একটা দুর্ভাবনা, চিন্তায় বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। সে খেলবে? কিন্তু কতদিন চর্চা নেই, সে কি পারবে খেলতে? হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। নিরঞ্জন অনুভব করল অন্ধকারে কে যেন তার পায়ের ওপর হাত রেখেছে, মৃদু চাপ দিচ্ছে। ঠিক এমনি একটা অনুভূতি সে উপলব্ধি করেছিল প্রায় এক বছর আগে। নিরঞ্জন এবার আর তেমন ভয় পেল না। সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল হাতটাকে। কিন্তু মুহূর্তেই সরে গেল যেন হাতটা। নিরঞ্জন শুয়ে শুয়ে না ঘুমিয়ে ভাবতে লাগল, সত্যিই কি কেউ হাত রেখেছিল? নাকি মনের ভুল? না, নার্ভের অসুখ? মনের অসুখ? কি হতে পারে? আবার তার ভয় করতে লাগল। কে তার ডান পায়ের ওপর হাত রাখল? একি সেই মৃত লোকটা? অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল অনেকক্ষণ নিরঞ্জন। মশারির বাইরে ঘরের কোণের জমাট অন্ধকারটা যেন এক পা কাটা মানুষের মূর্তি বলে মনে হলো তার। ভয়ে সে ঘামতে লাগল। নড়াচড়া করার শক্তিটুকুও তার লোপ পেল। বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল সে। কে যেন চেপে ধরেছে তাকে। অনেক জোর করে সে ছাড়াতে পারছে না। তবু এক সময় সে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালল। কেউ নেই ঘরে। জল খেল নিরঞ্জন। মাথায় ঘাড়ে কপালে জলের ছিটে দিল। অতি-রিক্ত গরমে সে নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আবার শুয়ে পড়ল নিরঞ্জন।

খেলা আরম্ভ হওয়ার আগেও তার ভয় করছিল। জার্সি পরবার পর সে আর একবার সে তার ডান পায়ের দিকে দেখল। তারপর তার দলের অধিনায়ক বলটা ছুঁড়ে দিলেন মাঠের মধ্যে। সে ছুটতে লাগল বলের পেছনে। খেলা আরম্ভ হলো। হৈ চৈ, চিৎকার, হাততালি সবকিছুই স্তিমিত হয়ে এল তার কাছে। কেমন যেন সম্মোহিত, তন্ময় হয়ে যেতে লাগল নিরঞ্জন। তার চৈতন্য,

বিবেক নিজের সম্পর্কে অনুভূতি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। নিরঞ্জন বুঝতে পারল, সে হারিয়ে যাচ্ছে। তার সচেতন চৈতন্য ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সে নিজেকে ভুলে যাচ্ছে। তবু সে খেলতেই লাগল।

কতক্ষণ পরে তার খেয়াল নেই, আবার সে তার স্বকীয় চেতনায় ফিরে এল জনতার উচ্ছ্বসিত চিৎকার আর হাততালিতে। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে তার কয়েকজন সহকর্মী অভিনন্দন জানাচ্ছিল। সে পর পর তিনটে গোল দিয়েছে। তার খেলার অভিনব কলাকৌশল ভঙ্গি দেখে মাঠের দর্শকরা উচ্ছ্বসিত করতালিতে বারবার অভিনন্দন জানিয়েছে তাকে। এমন খেলা নাকি গত কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার মাঠে দেখা যায় নি।

দু'একজন অভিজ্ঞ দর্শক, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার মাঠে খেলা দেখছেন তাঁরা শুধু স্মরণ করতে পারলেন আর একজনের কথা : নীরেন সান্যাল। লোকটা মাত্র কয়েকটা খেলা খেলেছিল বেশ ক' বছর। তারপরই উধাও হয়ে গেল খেলার জগৎ থেকে। লোকটার একটা দোষ ছিল, সেই দোষই তার সর্বনাশ করল। অতিরিক্ত মদ খেতো লোকটা। তার লিভারের আর কিছুই ছিল না। অসুখের মধ্যেও তার মদ খাওয়া কমেনি। মারাও গেল অবহেলা, অনাদর, আর ঘৃণার মধ্যে কোন্ এক হাসপাতালে। তার খেলার মাঠে দর্শকরা সেই খবর পায় নি।

* * *

নিরঞ্জন মজুমদার ওপরে উঠতে লাগল খ্যাতি ও মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে। সময় লাগল খুবই কম। হয়ত মানুষের ভাগ্যই এমন আশ্চর্য বিচিত্র! তাই সেই মরশুমে নিরঞ্জনকে দলে নেওয়ার জন্যে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর দল ঝুঁকে পড়ল। নিরঞ্জন একটা নামী দলই দলই বেছে নিল। এরপর এর একটি বিস্ময় রচনা করে চলল নিরঞ্জন। মাত্র কয়েকটি খেলাতেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। ফুটবলের মরশুমে শুধুমাত্র তার খেলা দেখবার জন্যেই ভেঙে পড়তে লাগল দর্শকের

দল। শুধুমাত্র একটি নাম : নিরঞ্জন মজুমদার—এন, মজুমদার। এই একটি নামই লোকের মুখে মুখে ঘুরছিল। অলিম্পিকের আসরে এবার ভারত নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারবে! এবার এশিয়ার নতুন বিস্ময় আলোড়ন আনবে সারা পৃথিবীতে—এমন মন্তব্য করা হলো জনপ্রিয় দু'একটি দৈনিকে। কবে কোন্ অতীত কালের দিকপাল খেলোয়াড় পেলে, ইউসেবিও ইত্যাদির সঙ্গেও কেউ কেউ তুলনা করলেন তার। খেলার জগতের অভিজ্ঞ সমালোচক ও ভাষ্যকাররা একযোগে ঘোষণা করলেন—এ কালের পৃথিবীর অন্যতম একটি বিশিষ্ট নাম এন্, মজুমদার, ফুটবল জগতের বিস্ময়। কোন এক বিদেশী কোম্পানী এক লক্ষ টাকায় তার ডান পা ইনসিওর করার প্রস্তাব পাঠাল।

সেদিনও বহু অভ্যাগত, বন্ধু, ও মুগ্ধ দর্শকদের বিদায় জানিয়ে ক্লাব থেকে বেরুল নিরঞ্জন। এক হাত দামী গাড়ির ষ্টিয়ারিং-এ রেখে সে গাড়ি চালাচ্ছিল, অন্য হাতে পুড়ছিল মূল্যবান বিদেশী সিগারেট—তারই এক ভক্তের উপহার। গাড়ি চালাতে চালাতে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিল। ভারতের সুনাম মর্যাদা এখন তার কাছে পুরনো মনে হলো, এখন সমুদ্রপারের নীল স্বপ্ন। য়ুরোপ আর আমেরিকার সুনাম-মর্যাদা না পেলে তো কিছুই হবে না। বোঝাই লরীটা পাশ কাটিয়ে সে চলে যাবে ভাবল, কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করল ষ্টিয়ারিংএর ওপর তার হাতকে যেন চেপে ধরেছে। তার ডান পাটা অসাড় হয়ে এল। সে ভয় পেল চকিতে। লরীটার পাশ কাটিয়ে সে যেতে পারল না। ধাক্কা লাগল প্রায় মুখোমুখি।

হৈ হৈ করে ছুটে এল পথচারী মানুষ, মুহূর্তের মধ্যে জনতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে। এন্ মজুমদারকে অনেকেই প্রথম চিনতে পারেনি, তবু দু'একজন তার গাড়িটাকে চিনতো। এন্ মজুমদারকে সত্যিই চেনার উপায় ছিল না। একমাত্র তার ডান পাটা ছাড়া বাকি সমস্ত শরীরটাই থেঁতলে পিষে গিয়েছিল লরীর ধাক্কায়।

ডক্টর মুখার্জির ক্লিনিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই।

ডক্টর মুখার্জি মাথা নাড়লেন। অনেকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার অচেতন মৃতদেহটার দিকে চেয়ে রইলেন। সেবার নীরেন সান্যালের মতো একটা বেওয়ারিশ মৃতদেহ জুটেছিল, তাই নিরঞ্জন তার ডান পাটা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু এবার? নিরঞ্জনের আত্মাটা কার সঙ্গে বদল করবেন? ডক্টর মুখার্জি হতাশ হয়ে আবার মাথা নাড়লেন।

*

আশ্চর্য!

৪নং সুলভ খণ্ড কিনেছেন?

কিনুন, উপহার দিন!

প্রায় হাজার পৃষ্ঠার প্রকাণ্ড বই

এর মধ্যে আছে ২৫৲ টাকা দামের ৮খানি সম্পূর্ণ উপন্যাস
৪০টি শংকা ও শিহরের বিচিত্র গল্প, অজস্র কার্টুন

যে সব লেখকদের লেখা আছে: প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, জুল্‌স্ ভর্ন, ইয়েফ্রেমভ, মনোরঞ্জন দে, প্রদীপ মিত্র, নারায়ণ চক্রবর্তী, মানিক বন্দোপাধ্যায়, শ্রীধর সেনাপতি প্রভৃতি। কাফী খাঁর কার্টুন।

দাম মাত্র পাঁচ টাকা (ডাকব্যয় ১·৫৭ প.)

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা ১৪

নীহারেন্দু
দাস

আবার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন !

ছবি এঁকেছেন : রেণু প্রধান

ডঃ বোসের নাম এখন হয়তো কেউ জানে না। দশ বছর আগে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে তাঁর মত পণ্ডিত ভারতে খুব কমই ছিলেন। ১৯৫৭ সালে পূজোর ছুটির সঙ্গে তিনি একমাস ছুটি নিলেন। তারপর তিনি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুদিন নানা গুজব চলল। আরও মাসখানেক বাদে আন্দামান থেকে ডঃ বোস চাকরী থেকে অবসর নেবার জন্যে আবেদন জানালেন। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর স্মৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল। কি জন্যেই বা তিনি অবসর নিলেন এবং কেনই বা তিনি আন্দামান গেলেন তা কেউ জানে না।

ডঃ বোস লেখাপড়ায় ছিলেন য়ুনিভার্সিটি স্কলার। কোনও কারণে তিনি বিয়ে করতে পারেন নি। তাই তাঁর সংসার ছিল নির্ঝঞ্ঝাটের। তিনি ছিলেন একটু অন্য ধরনের মানুষ। তিনি যা লিখতেন বা বলতেন তার প্রমাণসাপেক্ষ প্রতিবাদ করলে বা হাতেনাতে পরীক্ষার দ্বারা তার মত খণ্ডন করলেও তিনি তা মানতেন না। একবার তাঁর একটা প্রবন্ধ বিদেশী পত্রিকায় হৈ চৈ এনে দেয়। প্রবন্ধটির নাম ছিল, "পদার্থের মৃত্যু।" তাঁর মতে, মাইনাস তিনশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থেকে পদার্থের মৃত্যু শুরু হয় এবং মাইনাস দুশ তিয়াত্তর থেকে তিনশ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপমাত্রায় পদার্থের জীবন্মত অবস্থা থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও এক প্রদেশে প্রতিনিয়ত পদার্থের মৃত্যু ঘটছে। যেহেতু মৃত্যু ঘটছে সেই হেতু পদার্থের জন্ম ঘটতে হবে। কয়েকশো কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে হাইড্রোজেন জন্মাচ্ছে। হাইড্রোজেন হচ্ছে বিরানব্বুইটি পদার্থের জনক। দেশী ও বিদেশী বহু বৈজ্ঞানিক তাঁর মত খণ্ডন করেন। ফলে তিনি সাতদিন ঘর হতে বার হননি।

তাঁর সবগুলি প্রবন্ধই সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রতিটি মতই খণ্ডন করা হয়। তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ হচ্ছে 'পদার্থের রূপান্তর', 'প্রাণের অবিনাশত্ব ও তার রূপান্তর', 'নক্ষত্রের গতি', 'ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়', 'প্রাণের জন্ম ও আদি প্রাণের উদ্ভব', 'পদার্থ হতে প্রাণ', 'ইলেক্ট্রনের চরিত্র ও তার বিভাজন সম্ভব কিনা' ইত্যাদি। প্রতিটি প্রবন্ধের নাম দেখেই মনে হয় উদ্ভট পরিকল্পনা। তাঁর একটি মাত্র প্রবন্ধ বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা অর্জন করে :—'পদার্থ হতে প্রাণ।' বার বার হেরে গিয়ে তাঁর কাজে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে নির্জন জায়গায় বিজ্ঞান সাধনা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

সুযোগ এসে গেল। পূজোর ছুটির কয়েকদিন আগে আমেরিকা থেকে ডঃ স্যামুয়েল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ডঃ

স্যামুয়েলের সঙ্গে তাঁর গোপন পরামর্শ চলল কয়েকদিন। ডঃ স্যামুয়েল হচ্ছেন আমেরিকার একজন চিকিৎসক। তিনি ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করলেন এবং ভারত সরকারের কাছ হতে আন্দামানের পশুপাখি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে দ্বীপপুঞ্জের একটা ক্ষুদ্রদ্বীপ ব্যবহারের অনুমতি নিলেন। দ্বীপটি জনহীন এবং পোর্টব্লেয়ার হতে আড়াইশ মাইল দূরে অবস্থিত।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ডাঃ বোস পোর্টব্লেয়ার জাহাজ বন্দরে নামলেন। ডঃ স্যামুয়েল আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

ডঃ স্যামুয়েল বললেন, "গুড্ ইভনিং মিঃ বোস্, আশা করি আসতে কোন অসুবিধে হয় নি?"

—"গুড্ ইভনিং, না তেমন কিছু হয়নি। আপনার সব রেডি?"

—"হ্যাঁ, চলুন হোটেলে। ওখানেই কথাবার্তা হবে।"

তিনতলা ছিমছাম ছোট এক হোটেল। উপরতলার একই ঘরে দুজনের থাকার বন্দোবস্ত। ডঃ স্যামুয়েল এসেছেন মাসখানেক আগে। সমস্ত কিছু যন্ত্রপাতি, একটা মোটর বোট ও তার মোটর গাড়ীটা কয়েকদিনের মধ্যেই আমেরিকা থেকে এসে পড়বে। মোটর গাড়ীটা পোর্টব্লেয়ারে ব্যবহারের জন্যে থাকবে।

নানা কারণে বিলম্ব ঘটায় তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নভেম্বরের মাঝামাঝি এসে গেল। ১লা ডিসেম্বর তাদের যাত্রা শুরু হল। বিকেল তিনটেয় তাঁরা দ্বীপে পৌঁছলেন। সঙ্গে আছে চারজন পোর্টার বা হেল্পার। মাসিক তিনশ টাকা বেতনে তারা আসতে রাজি হয়েছে। ডঃ বোস এ দ্বীপে আগে আসেন নি। ডঃ স্যামুয়েলই দ্বীপ নির্বাচন করেছিলেন।

পোর্টাররা যখন মালপত্র নামাতে ব্যস্ত তখন তাঁরা দুজনে দ্বীপে বেড়াতে লাগলেন। ডঃ বোসকে ডঃ স্যামুয়েল তাঁর নির্বাচিত বসবাসের জায়গাটা দেখালেন।

—"ঐ যে ডঃ বোস, ছোট টিলাটা দেখছেন ওর ওপাশে আমাদের বাসস্থান হবে। কারণ ঐটাই সব থেকে উপযুক্ত জায়গা। আপাততঃ মাসকয়েক তাঁবুতেই কাজ সারব। পরে আপনার কথামত এখানেই ইঁট পুড়িয়ে একটা পাকা বন্দোবস্ত করব। এবিষয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করাই ভাল।"

—"হ্যাঁ, উনি তো এখন দিল্লিতে। আমাদের বন্দোবস্ত করতে করতে তো জানুয়ারী মাস এসে পড়বে। এখন ভেবে দেখছি ল্যাবরেটরিটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড করলেই ভাল হয়। তার উপরে কমিশনার রিপ্রেজেণ্টেটিভকে দেখানর জন্যে ল্যাবরেটরি থাকবে।"

—"ভাল যুক্তি। আশা করি আমরা সফল হব"

এতক্ষণে তারা নির্দিষ্ট স্থানে এসে পড়েছেন। দুজন পোর্টার মাল নিয়ে আসছে এবং দুজন তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত। প্রায় সন্ধ্যের সময় তাদের সমস্ত কাজ শেষ হল। পর পর দুটো তাঁবু খাটান হয়েছে। একটা ডঃ বোস ও ডঃ স্যামুয়েলের এবং সামান্য দূরে পোর্টারদের। আজ সবাই পরিশ্রান্ত দুজন পোর্টার মোটরবোটে থাকার বন্দোবস্ত হল। আর দুজন তাদের তাঁবুতে থাকবে।

ডঃ বোস ষ্টোরেজসেল থেকে তাঁবুতে বিদ্যুতের বন্দোবস্ত করতে করতে বললেন, "জঙ্গল তো বেশ গভীর, কোন হিংস্র পশু নেই তো?"

ডঃ স্যামুয়েল বললেন, "না, শুয়োর ছাড়া কিছু নেই। কিছুদিন পরে রোষ্ট্ করা যেতে পারে।"

শুকনো খাবার খেয়ে আজকের মত দুজনে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লেন। ডঃ বোস অভ্যেসবশতঃ ঘুমের আগে একটা সিগারেট ধরালেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা কাজচলার মত ল্যাবরেটরি বানিয়ে ফেললেন। এবং টুকটাক্ কাজ চলতে লাগল তাদের। বিভিন্ন গাছের পাতা হতে রস তাদের সংরক্ষণে আছে। সেই রস বিভাজন

কাজে মত্ত হলেন দুজনে। এক গাছকে অন্য গাছে রূপান্তরিত করতে পারলেই তাদের আসল কাজ শুরু হবে।

ইতিমধ্যে ডঃ বোস কমিশানের কাছ হতে পাকা ল্যাবরেটরি করার অনুমতি যোগাড় করে এনেছেন। ল্যাবরেটরি তৈরী শুরু হবে মার্চ মাস থেকে। পোর্টব্লেয়ার থেকে আরও ছজন ইঁট তৈরীর কারিগর এসেছে। তারা পুরোদমে কাজ করে চলেছে। এর জন্যে তারা পাচ্ছে ডবল মজুরি। আগামী জুনে সরকারী প্রতিনিধি এসে দেখে যাবেন তাঁরা কি করছেন। ডঃ স্যামুয়েল ও ডঃ বোস দুজনেই খুব কর্মব্যস্ত। শুধু গবেষণায় তাঁরা নিযুক্ত নন। যাতে তাড়াতাড়ি ইঁট তৈরী শেষ হয় সেই দিকে তাঁদের লক্ষ্য। কারণ তাঁরা সরকারের বিনা অনুমতিতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরি করতে বদ্ধপরিকর।

মার্চের গোড়ার দিকে মাটি খোঁড়ার মজুর ও অন্যান্য শ্রমিকদের ধীরে ধীরে নিয়ে আসা হল এবং মে মাসের মাঝামাঝি আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘর শেষ হল এবং জুলাই মাসে ঘর তৈরী শেষ হয়ে গেল। ডঃ বোসের অনুরোধে আগষ্টে সরকারী প্রতিনিধি এলেন। তাঁকে জানান হয়েছিল যে ঘরতৈরী নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত হবে না। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘরে যাবার রাস্তা প্রধান মিস্ত্রি ও বৈজ্ঞানিক দুজন ছাড়া কেউ জানে না।

২০শে আগষ্ট, ১৯৫৮। সমস্ত মিস্ত্রি মজুর ও কারিগরদের একটা বড় ভোজ দেওয়া হল। এদের সংখ্যা স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক। অনেকে পরিবার সমেত এসেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া হৈহুল্লোড় চলল। তারপর যে যার ছাউনিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আগামী কাল থেকে তারা ১০।১২ জন করে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরতে শুরু করবে।

রাত্রি প্রায় বারোটা। ডঃ স্যামুয়েল ও ডঃ বোস জেগে আছেন তাঁদের তাঁবুতে।

ডঃ বোস বললেন, "চলুন ডঃ স্যামুয়েল, আমাদের কাজ শুরু করি। ওদের মরণ ঘুম শুরু হয়ে গেছে।"

ডঃ স্যামুয়েল উঠলেন, "হ্যাঁ, চলুন।"

ভোজের খাবারের সঙ্গে তাদের আবিষ্কৃত এক ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে এরা মরণঘুমে আক্রান্ত হয়েছে। এ এ ঘুম এদের আর ভাঙবে না। শুধু মাত্র একজন পাচক ও প্রথমের চারজন পোর্টারকে অন্য খাবার দেওয়া হয়েছে। তাদের খাবারের সঙ্গেও ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা কাল অনেক বেলায় ওঠে।

সারারাত তাঁরা উনিশটি পুরুষ, ষোলটি স্ত্রীলোক, ছত্রিশটি বালক, তেরটি বালিকা ও পাঁচটি শিশুকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঘরে এনে জমা করলেন। প্রতিটি দেহে তাঁরা রাসায়নিক আরক মাখিয়ে দিলেন যাতে না পচে যায়। তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও মালপত্র পুড়িয়ে দিয়ে যখন তাঁরা শয্যা নিলেন তখন বেলা দশটা।

সকলের অলক্ষ্যে উননব্বুইটি খুন হয়ে গেল। সবগুলিই ঠাণ্ডা মাথায় খুন। পোর্টারদের জানিয়ে দেওয়া হল লঞ্চে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সরল মানুষ ডঃদের কথা সহজভাবে বিশ্বাস করে নিল।

ডঃ বোস ও ডঃ স্যামুয়েলের যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের তাদের পূর্ববর্তী গবেষণায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন। এবার শুরু হল তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম। দিনরাত শবব্যবচ্ছেদ করে মনুষ্যদেহের প্রতিটি অংশ বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ১৯৬২ সালে তাদের মানুষগড়ার জন্যে যাবতীয় কাঁচামাল প্রস্তুত রইল। এবার তাঁরা যন্ত্রতৈরীতে মনো-নিবেশ করলেন। উপরের ল্যাবরেটরিতে সরকারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আজেবাজে কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলেন তাঁরা। মাসে দুএকবার পোর্টব্লেয়ার গিয়ে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি নিয়ে আসতেন। যাতে খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে না হয়।

১৯৬৪ সালে দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গোটা ঘর জুড়ে এক মেশিন তৈরী করলেন। বিশটা ষ্টোরেজ সেল হতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে মেশিনটা যেদিন তাঁরা চালু করলেন দুজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন।

—"ডঃ বোস, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী-বিখ্যাত হতে চলেছি।"

—"শুধু তাই নয় ডঃ স্যামুয়েল, নতুন মানুষকে আমরা ইচ্ছা করলে অসীম শক্তিশালী এবং অমর করতে পারি। প্রয়োজন বোধে এদের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারি।"

—"সে কথা পরে। আসুন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। প্রথম কাজ আমাদের অস্থি সংস্থান। আপনি স্ত্রী-অস্থিগুলো আমাকে একে একে দিন। আপনি পুরুষের অস্থিগুলো একে একে হিসেব করে পুরুষ অংশে প্রবেশ করাতে থাকুন।"

এইভাবে তাদের কাজ শুরু হল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কাজ। অস্থি সংযোজন, হৃৎপিণ্ড স্থাপন, শিরা, উপশিরা, রক্ত প্রভৃতি মনুষ্য দেহের হাজারো অংশ সংযোজন। মেশিন আলোর সাহায্যে বলে দেয় কখন কি প্রয়োজন। শিফ্‌টিং ডিউটি করে দুজনে কাজ করেন। সবগুলি স্ত্রীপুরুষের দেহাংশ দিয়ে তাঁরা দুটি মানুষ গড়তে চলেছেন। প্রচুর দেহাংশগুলোকে মেশিন কণ্ডেন্স করে নিয়ে নির্দিষ্ট অংশে জুড়ে দেয়।

এইভাবে চলল তাদের মানুষ গড়ার কাজ। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে তারা দুটি মানুষ গড়তে সক্ষম হলেন। শুধু বাকি রইল প্রাণ সংস্থাপন ও বিচার শক্তি দেওয়া। এ দুটি কাজ করার আগে দুজনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন ভুল আছে কিনা। সামান্য ভুল থাকলে তার ফল পরে হয়তো অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। হ্যাঁ, ভুল একটু হয়েছে। দুটি দেহেই ডান পায়ের বুড়ো আঙুল অস্বাভাবিক রকম ছোট হয়েছে। আজ

রাত্রে হুজনে ভুল হুটো সংশোধন করবেন, তারপর প্রাণ দেবেন নতুন মানুষ হুটিকে।

রাত্রি বারোটা। ডঃ স্যামুয়েল কাটা পায়ের আঙুল হুটোতে হাড় সংযোজন করছেন। ডঃ বোস ঘরের এককোণে বসে বসে বিদ্যুৎ ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করছেন। হঠাৎ ডঃ স্যামুয়েল অসাবধানবশত প্রচণ্ড শক পেলেন। ঘুরে পড়লেন তিনি। তাঁর বাঁহাতটা পড়ল প্রাণ সঞ্চারণ সুইচটার ওপর। কাজ করতে করতে তাঁরা এর আগে বহুবার শক পেয়েছেন। কয়েক মিনিটেই ডঃ স্যামুয়েল বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। তিনি ছুটে যেন সুইচটা বন্ধ করতে যাবার আগেই ধরা পড়ে গেলেন তাঁদেরই তৈরী পুরুষ মানুষটির মুষ্টিতে।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি, "ডঃ বোস—"

ডঃ বোস এতক্ষণ ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। পুরুষটা মাথা হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তারের জাল ছিঁড়ে ফেলেছে। হু পা দিয়ে ডঃ স্যামুয়েলকে কায়দা করে ধরে হাত দিয়ে তাঁর মাথাটা মেঝেয় ঠুকে ভেঙে ফেলে মুখ দিয়ে ভিতরের অংশগুলো খেতে শুরু করেছে। স্ত্রীটি তখন ধীরে ধীরে উঠে বসেছে। ডঃ বোস আর এক সেকেণ্ডও দেরী করলেন না। তাঁর সামনেই ছিল গুপ্ত পথ।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন সমুদ্রের দিকে। পাথরের ঠোক্করে কয়েকবার মাটিতে পড়ে গেলেন। পিছনের দিকে না তাকিয়েই তিনি ছুটলেন সমুদ্রের দিকে। মোটর বোটে উঠেই প্রচণ্ড গতিতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চালিয়ে দিলেন। মোটর বোটে একজন মাত্র পোর্টার ছিল। সে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না।

পরদিন সকাল। ডঃ বোস ষ্টীয়ারিং ধরে প্রলাপ বকে চলেছেন ডিজেল অভাবে মোটর বোটটা শুধু ভাসছে সমুদ্রে। ডঃ বোস পাগল

হয়ে গেছেন। সামান্য অসাবধানতার জন্যে তাঁদের এত বড় একটা আবিষ্কার বিফল হয়ে গেল। যা সৃষ্টি হল তা মানুষ নয়—নররাক্ষস।

বেলা তিনটের সময় একটা আমেরিকান খাদ্যবাহী জাহাজ দেখতে পেয়ে এদের উদ্ধার করে। কোলকাতা বন্দরে যখন জাহাজ ভিড়ল তখন ডঃ বোস বদ্ধ পাগল। তাঁর ঠাঁই হল রাঁচির পাগলা গারদে।

তাঁর সব সময় ভয়। মুখে এক কথা, "ঐ ওরা আসছে। আমাকে ওরা হত্যা করে আমার মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড উপড়ে খেয়ে আরও শক্তিমান হবে। যত মানুষ খাবে তত ওরা শক্তিমান হবে তত ওদের পরমায়ু বাড়বে। ওরা পৃথিবী ধ্বংস করবে। তোমরা ওদের ধ্বংস কর। এক কাজ কর, দ্বীপটাকে অ্যাটম বোমা মেরে উড়িয়ে দাও।" ইত্যাদি। বকতে বকতে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে যান তখন কাঁদেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ শিশুর মত কাঁদেন।

কেউই পাগলের কথা বিশ্বাস করে না। প্রলাপ মনে করে। কিছুদিন বাদে ভয়াবহ খবর আসে। নররাক্ষস দুটি মানুষের মধ্যে মিশে গেছে এবং ক্রমাগত মানুষ ধ্বংস করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য কেবল মাথা ও হৃৎপিণ্ড। কে এদের খুঁজে বার করবে? কে এদের ধ্বংস করবে? কেমন করেই বা তারা নিরালা দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে এল?

(২)

ঘটনাটা টপ্ মিলিটারি সিক্রেট ছিল। আন্দামানের চীফ কমিশনার তাঁর কাজের জন্যে চার্জশীট পেয়েছেন। ঘটনাটা চাপা ছিল যতদিন তারা (নতুন মানুষ দুটি) দ্বীপে ছিল। তারা যখন মূল ভূখণ্ডে এসে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল এবং রাঁচির পাগলা গারদের ডঃ বোসের কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যেতে লাগল, তখন কয়েক দিনের

মধ্যে সারা পৃথিবীতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। ভারতীয়দের বিদেশ যাতায়াতে কড়া বিধিনিষেধ করা হল স্বদেশে এবং বিদেশে।

গাফিলতির জন্যে গতমাসে চীফ কমিশনারের দ্বীপ পরিদর্শক বৈজ্ঞানিকদের জন্যে সংরক্ষিত দ্বীপে যেতে পারেন নি। এ মাসে এসে তাঁরা—পরিদর্শক, লঞ্চ ড্রাইভার ও দুজন সহকারী নিশ্চিন্ত মনে বৈজ্ঞানিকদের ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে চললেন। যাবার সময় কোন বিপত্তিই হল না। তাঁরা গিয়ে দেখেন ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ভাঙা চোরা। ডঃ বোস ও ডঃ স্যামুয়েলের পাত্তা না পেয়ে অবাক হয়ে যান। তাঁরা পাতাল ঘরে যাওয়ার গুপ্ত দরজাও খুঁজে পান। কারণ সেটা খোলাই ছিল। নীচে গিয়ে তাঁরা হতবাক হয়ে যান। বিস্তর মেশিন ভাঙা চোরা অবস্থায় পড়ে, হাড়গোড় প্রভৃতি দেহাংশ এধার ওধার ছড়ান এবং মেঝেতে ডঃ স্যামুয়েলের গলিত শবদেহ দেখে তাঁরা চিনতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আর যারা দ্বীপে ছিল তাদেরও নররাক্ষস দুটি হত্যা করেছিল।

পরিদর্শক অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে তারা যা দেখছে তার নোট দিতে থাকেন। কাজ শেষ করে তাঁরা ল্যাবরেটরি থেকে যখন বেরোচ্ছেন তখন অতর্কিতে আক্রান্ত হন দুটি উলঙ্গ মানুষ দ্বারা। একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ। তারা দুজন লোককে ধরে নিশ্চিন্ত মনে তাদের কাজ শুরু করে। প্রথমে আছাড় মেরে মাথাটা ফাটিয়ে খেতে থাকে। বাকি দুজন প্রাণভয়ে ছুটতে থাকেন সমুদ্রের দিকে। নররাক্ষসদের সেদিকে খেয়াল নেই। পরিদর্শক ও একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট প্রাণে বেঁচে যান।

পরিদর্শকের কাছ হতে সমস্ত খবর শুনেই চীফ কমিশনার প্রেসিডেণ্টকে সঙ্গে সঙ্গে বেতার বার্তায় খবর জানান। দ্বীপটিকে প্রটেক্টেড্ এরিয়া করা হয়। সি-বি-আই পাগল ডঃ বোসের উক্তির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে দ্বীপটিতে মিলিটারি অপারেশনের পক্ষে রায় দেয়। ঐ দুটি মানুষকে জীবন্ত না ধরতে পারলে মুস্কিল। কিন্তু

মিলিটারি অপারেশনে কোন ফল হল না। দ্বীপ জনমানব শূন্য।

মিলিটারি অপারেশন অনেক দেরীতে হয়েছিল। তার তিনদিন আগেই তারা নতুনকে জানার জন্যে সমুদ্রে সাঁতার দিতে শুরু করেছিল। অসীম শক্তিশালী তারা। সমুদ্রের ঢেউয়ের দাপট তারা অনায়াসে সহ্য করতে পারছিল। পুরো দুদিন সাঁতারে তারা কূল হীন মাঝ দরিয়ায় অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবার অষ্ট্রেলিয়ান গমবাহী জাহাজ ডুবন্ত মানুষ মনে করে তাদের তুলে নেয় ও বস্ত্র দেয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা বলে যে মাছধরা ট্রলি ডুবে যাওয়ায় তাদের এই অবস্থা হয়েছে। জাহাজের কেউই অবিশ্বাস করে না। আত্ম-পরিচয় এমন ভাবে তারা দিয়েছিল যে সন্দেহ করা উচিত নয়।

জাহাজে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কারণ দুজনেই বেশী-ক্ষণ ঘুমিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মানুষ দুটি অসামান্য গুণের অধিকারী যাতে হয় সেইভাবে তাদের তৈরী করা হয়েছিল। এবং জন্মের পরেও কয়েকজনের ব্রেন ও হৃৎপিণ্ড আত্মসাৎ করে সর্ব গুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল ; শুধু ছিল না বিচারবোধ।

জাহাজ কোলকাতায় পৌঁছানর পর হট্টগোলে তারা যে কোথায় হারিয়ে যায় কেউ তার খবর রাখে না।

এরপর থেকেই কোলকাতায় শুরু হল বিভীষিকা। প্রায় প্রতি দিনই একই ভাবে মানুষ খুন হচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগ নাজেহাল হয়ে যেতে লাগল খুনী না ধরতে পেরে। দেশে বিদেশে এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল তারা ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গে ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তানের শাসনকর্তারা হৈ চৈ শুরু করে দিল। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। রাষ্ট্রসংঘ সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করায় পাকিস্তানের হৈ চৈ একটু কমল। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেল রেঙ্গুনে এভাবে খুন হচ্ছে। স্কটল্যাণ্ড

ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ও পৃথিবীর নানা দেশের ধুরন্ধর গোয়েন্দারা মানুষ দুটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

এদিকে বিভিন্ন দেশের বড় বড় মানসিক ডাক্তারেরা সমবেত ভাবে চেষ্টা করছেন ডঃ বোসকে ভাল করে তোলবার; কারণ হয়তো তিনি পথ বলে দিতে পারেন। কিন্তু কয়েক মাসের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হল। ডঃ বোস এক রাত্রে প্রচণ্ড ভয়ে হার্টফেল করলেন। এবং এই কয়েক মাসে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই তারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে, স্ত্রী ও পুরুষটি একই সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এক-একজন এখন পাঁচ হাজার মানুষের সমান শক্তিশালী, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ।

ডঃ সোনী জাপান থেকে এসেছিলেন ডঃ বোসের চিকিৎসার জন্যে। তিনিই একমাত্র ডঃ বোসের কাছাকাছি থাকতেন। তিনি ডঃ বোসের অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করে রিপোর্ট পাঠালেন কর্তাদের। ডঃ সোনীর মতে মানুষ দুটির সনাক্তকরণ অতি সহজেই হবে। কারণ মানুষ দুটির ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নেই। সোনীর মতের সত্যতা যাচাই করা হল অষ্ট্রেলিয়ান জাহাজের নাবিকের উক্তিতে। জল থেকে তোলার সময়ে সে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিল পুরুষটার একটা পায়ের বুড়ো আঙুল নেই। স্ত্রীটির সে লক্ষ্য করে নি। কারণ দুটি দেহই সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ফেলা হয়েছিল।

যাই হোক ডঃ সোনীর মত অনুযায়ী যে দেশে ঐ ঘটনা ঘটছে সেই দেশের বিমান ও নৌ বন্দরে প্রতিটি যাত্রীর গোপনে এক্সরে করার বন্দোবস্ত হল। ঘটনাটি ঘটছিল ফ্রান্সে। কয়েক দিনের মধ্যেই এক দম্পতির ঐ চিহ্ন ধরা পড়ল প্যারিস বিমান বন্দরে। তাঁদের গন্তব্যস্থল ছিল কায়রো। সঙ্গে সঙ্গে কায়রোতে বেতার বার্তা গেল। পিছনে লাগল দুজন গোয়েন্দা। কায়রো বিমান বন্দরে এক্সরে করা হল। স্থির নিশ্চিন্ত হল গোয়েন্দা বিভাগ। হোটেলে তাদের

উপর কড়া নজর রাখা হল। তাদের পরিচয় পত্রে আছে "আমেরিকার ভ্রাম্যমান বাণিজ্যিক প্রতিনিধি," খবর নিয়ে জানা গেল যে ঐ নামেই আমেরিকান ভ্রাম্যমান বাণিজ্যিক প্রতিনিধি আছেন। অর্থাৎ মানুষকে খুন করে তার দেহকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে তারা। কিন্তু তাদের আসল চেহারায় যে খুঁৎ থেকে গিয়েছে তা কোনও দিনই তারা ফিরে পাবে না।

পরদিন দেখা গেল তারা ভোল পাল্টে মিশরেরই বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মানুষ ধ্বংস করে চলেছে। ঝানু গোয়েন্দারা পড়লেন গোলকধাঁধায়। মুস্কিল হল এই মানুষ দুটি বিভিন্ন দেশের ভি-আই-পিদের আত্মসাৎ করে সেই চেহারা ধরে এক দেশ হতে অন্য-দেশে চলে যাচ্ছে। পরে কোনও দেশের প্রধান ও তার স্ত্রীর দেহ আত্মসাৎ করলেই হবে সব থেকে বড় বিপদ। যাতে এ ঘটনা না ঘটে তার জন্যে প্রতিটি দেশের প্রধানদের গোপনে সতর্ক করে দেওয়া হল। পৃথিবীর জনসাধারণ এসব বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানলো না।

কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেল তুরস্কের একজন সামরিক অফিসার ও তার স্ত্রী দুজনে ইস্তানবুল রওনা হলেন। তাঁরা এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। এয়ারপোর্টে দেখা গেল তাদের পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি নেই। আজকাল আর মানুষ খুন হচ্ছে না। মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। এদের পিছনে পিছনে যে গোয়েন্দা বাহিনী ঘুরছে তারাই বুঝতে পারছে কেন এই ঘটনা ঘটছে। বিশ্ববাসীকে কিছুদিন আগে এরা (গোয়েন্দা বিভাগ) ধোঁকা দিয়েছেন যে নররাক্ষস দুটি ধ্বংস করা হয়েছে। পারমাণবিক চুল্লীতে তাদের দেহ ছাই হয়ে গেছে। ইত্যাদি। পৃথিবীর মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু তারা মোটেই জানে না কি ভয়াবহ ঘটনা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

তুরস্কে ঘটল এক দুর্ঘটনা। বিমান বন্দর হতে বার হয়ে মেজর জেনারেল ও তাঁর স্ত্রী যখন গাড়ীতে উঠছিলেন তখন উগ্রপন্থী একজন লোক তাঁকে গুলী করে। ফলে মেজর জেনারেল মাটিতে পড়ে যান। হট্টগোলে তারা মেজর জেনারেলের দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধরে পালিয়েছে। খবর বের হল "বিপক্ষ পার্টির একজন মেজর জেনারেলকে খুন করেছে এবং মিসেস ভয়ে মারা গেছেন।" গোয়েন্দা বিভাগ আসল ব্যাপার জানতে পেরে চিন্তিত হল।

এবার ডঃ সোনী এক নতুন সূত্র দিলেন। স্ত্রী ও পুরুষটি কোনও ক্রমে আলাদা করে ফেলা হোক। যার ফলে আলাদা আলাদাভাবে দুজনকেই ধ্বংস করা সম্ভব হবে। এদের ধ্বংস করার জন্যে এবার কতকগুলি ফাঁদ রচনা করা হল। যেহেতু দুজনেই বিমানযাত্রী সেইজন্যে বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুমে ইলেকট্রিক চেয়ার বসান হল। বিমানে তাদের সংরক্ষিত আসনেও বৈদ্যুতিক চেয়ারের বন্দোবস্ত করা হল। মিথ্যে প্লেন রাখা হল যা সহজদাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরী। কিন্তু সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হল। কেমন করে আগে থেকে জানতে পেরে তারা তাদের যাত্রা পরিত্যাগ করছে। পুরুষটিকে স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলও ব্যর্থ হল। সমস্যা আরও জটিল পর্যায়ে এসে গেল যখন তারা নবনিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বনে ঘানার প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট-পত্নীকে আত্মসাৎ করল।

অনেকেই অবাক হবেন দুটি মাত্র মানুষকে কেন মারা সম্ভব হচ্ছে না? বিংশ শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্র তাদের মারার পক্ষে কি উপযুক্ত নয়? প্রথম অসুবিধে হচ্ছে তারা যত মানুষ আত্মসাৎ করেছে তত শক্তির অধিকারী। একটা বন্দুকের গুলী দিয়ে যদি একজনকে মারা সম্ভব হয় তাহলে এদের একজনকে মারতে আজ সাতহাজার বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠতে হবে। যদি তারা সাতহাজার একজনের ক্ষমতায় অধিকারী হয় তাহলে সেই একজন বেঁচে থেকে আবার শুরু করবে

তার কাজ। সে হবে আরও সাবধান। দ্বিতীয় অসুবিধে, এরা ভি-আই-পি বনে গেছে। এদের মারা একটু কঠিন। তৃতীয় কথা, এরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে, এদের মারার চক্রান্ত হচ্ছে তাহলে পৃথিবীতে তাণ্ডব শুরু করে দিতে পারে। সেইজন্যেই জনসাধারণকেও জানতে দেওয়া হচ্ছে না এরা জীবিত আছে। এতে গোয়েন্দা বিভাগের কাজেরও সুবিধে হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে আক্রান্ত হল পৃথিবীর গোটাকয়েক ঝানু গোয়েন্দাদের কর্মস্থল।

একজন গোয়েন্দা অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। ধরা পড়ে গেল এবং পুরুষটিকে তাকে আত্মসাৎ করল। সে নিয়ে গিয়েছিল পটাশিয়াম সায়ানাইড দ্রবণের সিরিঞ্জ। কোনও রকমে তার রক্তের সংস্পর্শে ঐ দ্রবণ আসলেই মৃত্যু হত দেহটির। একজনের মৃত্যু হলে জোড়ের অভাবে অন্যটিকে মারা সহজ-সাধ্য হতো। এই ছিল গোয়েন্দাদের অভিমত।

অনেকদিন আগে এক আমেরিকান গোয়েন্দা তার কাজ শুরু করে ছিল এদের ধ্বংসের জন্যে। কয়েক মাসের মধ্যে তার পদ্ধতি পরীক্ষা করা হবে। একটি পুরুষাকৃতি ও একটি মহিলাকৃতির দুটি যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে দুটি আধুনিক ছোট অথচ উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত মেশিন-গান রাখা হয়েছে। যন্ত্র দুটিকে ইচ্ছামত রেডিও দ্বারা পরিচালিত করা সম্ভব।

নির্দিষ্ট দিনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট-পত্নী আক্রায় বেড়াতে এলেন। বিমানঘাঁটিতে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে গেলেন। ঘানার প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ঘানার প্রেসিডেন্ট-পত্নী সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের।

এমন সময় ঘটল এক অঘটন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পত্নী ঘানার প্রেসিডেন্ট-পত্নীকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘানার প্রেসিডেন্টকে জড়িয়ে ধরলেন। অভ্যাগতরা মনে

করল বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখান হচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শুরু হল মেশিন-গান। অভ্যাগতরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে। দুটি নররাক্ষস ধরা পড়ে গেছে দুটি মেশিনের বজ্রকঠিন বাহুতে। তারা বহু চেষ্টা করতে লাগল বাঁধন ছাড়াতে কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। দুটি জোড়ের ধস্তাধস্তিতে ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত ভেঙে গেল কিন্তু যন্ত্রটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারল না। দুটো হাত আর পা যদি এদের খোলা থাকত তাহলে হয়তো এ যন্ত্রকে তারা অনায়াসেই দুমড়ে ফেলতে পারত কিন্তু তাও সম্ভব নয়। অক্টোপোসের মত এদের বেঁধে ফেলা হয়েছে। যন্ত্রের মেশিন-গান কাজ করে চলেছে। একে একে ধ্বংস করছে মানুষের শত্রুটির শক্তিকে।

গোয়েন্দা বাহিনীও চুপ করে বসে নেই তারাও দুটি বস্তুকে লক্ষ্য করে চালাচ্ছে রাইফেল। কিন্তু ভুল বুঝল ঘানার মিলিটারি। তারা তাদের প্রেসিডেণ্টকে বাঁচাবার জন্যে গোয়েন্দা বাহিনীকে আক্রমণ করল। সমস্ত বিষয় সেনাধ্যক্ষ যখন জানালেন তখন তিন ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল মৃত নররাক্ষস দুটি মেশিন দুটি সমেত পড়ে আছে। সমবেত সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দেহ দুটিকে ইলেকট্রিক চুল্লীতে ধ্বংস করে দেওয়া হল যাতে তাদের মধ্যে এক-কণাও প্রাণের আবির্ভাব না হয়।

পরে পৃথিবীবাসীদের এ ঘটনা জানান হয়। প্রতিটি মানুষই এ ঘটনা শুনে শিহরিত হয়েছিল এবং সবাই সেই আমেরিকান গোয়েন্দাটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল।

আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ টন ধান আর তরমুজ লিচু বৃষ্টি হচ্ছে সারা পৃথিবীতে···
গড়ের মাঠে ধানের পাহাড় জমে গেল···ঘুচে গেল খাদ্যাভাব···কিন্তু কে
ফেলছে এই খাদ্য? অবিশ্বাস্য অসম্ভব হলেও এ ঘটনা একদিন ঘটতে পারে···

কে ঝরালো ধান লিচু আম জাম তরমুজ!

ছবি এঁকেছেন : রেণু প্রধান

উপেন মান্না

শিলাবৃষ্টি। অগ্নিবৃষ্টি। মৎস্যবৃষ্টি। পৃথিবীতে যাবতীয় বৃষ্টির সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু কয়েক দিন ধরে থেকে থেকে যে অদ্ভুত বৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় বুঝি এই প্রথম। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের পাতায় কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তেমন আশাপ্রদ নয়। অথচ কাল্পনিক বিষয়বস্তুই বর্তমানে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং তা নিয়ে পৃথিবীতে তুমুল সোরগোলের সৃষ্টি হলেও কেউই এর সঠিক কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হচ্ছে না।

সারা বিশ্বের সেরা সেরা বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হয়েছেন ব্যাপারটার একটা সঠিক কারণ অনুসন্ধানের আশায়। এর একটা নির্ভুল মীমাংসা না হলে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কলঙ্ক চিরকালের জন্যে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ক'লকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সামনে ব্রিগেড্ প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে বিরাট এক সামিয়ানার তলায় বসেছে বৈজ্ঞানিকদের সভা। পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত রাজ্যই (বা রাষ্ট্র) প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন এই মহতী সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর পালই এই মহতী সভার উদ্যোক্তা এবং আহ্বায়ক দুই-ই।

সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর বাট্‌লার। একে একে বহু দেশের প্রতিনিধিরা বর্তমানের এর অত্যদ্ভুত বর্ষণের বিবরণ প্রদান করলেন কিন্তু কেউই কোনরূপ সূত্রের সন্ধান দিতে পারলেন না। কিন্তু, ডক্টর ভাঁর্দো তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটু ক্ষীণ আশার আলো ফুটিয়ে তুললেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ ও তাঁর যুক্তির সারবত্তা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। ডক্টর ভাঁর্দো বক্তৃতামঞ্চে উঠে বলতে শুরু করলেন—মাননীয় এবং শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং বৈজ্ঞানিক বন্ধুগণ, গত কয়দিন ধরে পৃথিবীর বুকে যে অদ্ভুত বর্ষণ হচ্ছে তাতে যে কেবল সাধারণ মানুষই বিস্ময়ান্বিত

হয়েছেন তা নয়। বিজ্ঞান জগতেও এক ভীষণ আলোড়ন এনে দিয়েছে। কেন না, এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত আমরা দিতে সক্ষম হইনি। আমরা যে-সমস্ত রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে দেখা যায়, প্রথম আম্র-বৃষ্টি শুরু হয় প্যারিস্ সহরের ওপর। সৌভাগ্যক্রমে আমি সে সময়ে প্যারিসেই ছিলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে আম নেমে আসতে লাগলো মহাশূন্য থেকে। রাস্তাঘাট, বাড়ীর ছাদ, ভর্তি হয়ে উঠলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। প্রথমটা সবাই অবাক হয়ে পালিয়ে গেল। কেউ ভয়ে, কেউ বা আত্মরক্ষার তাগিদে। বৃষ্টি থামা মাত্রই সবাই ছুটে এসে মহানন্দে সেই আম খেতে আরম্ভ করে দিলো। কেউ কেউ বস্তায় করে, ঝুড়িতে করে নিয়ে চললো বাড়ীর দিকে। ছেলে, বুড়ো, যুবক যুবতী সবাই মিলে পরমানন্দে সুমিষ্ট আমের স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আর ভগবানকে দু'হাত তুলে প্রণাম জানাতে লাগলো তাঁর অপরিসীম করুণার জন্যে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, আমগুলি এত সুমিষ্ট এবং আঘ্রাণযুক্ত যে ভারতবর্ষের আম যা সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত, তাকেও এর কাছে নিকৃষ্ট বলে প্রতীয়মান হবে। যাই হোক আমিও কিছু আম তুলে নিয়ে এলাম বাড়ীতে। ল্যাবরেটরীতে আমগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখলাম। পৃথিবীর আমের সঙ্গে তেমন কোন অসাদৃশ্য ধরা পড়লো না। আপনারা জানেন সময়টা ছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি—যে সময় পৃথিবীর কোন অংশেই আম জন্মায় না। আপনারা আরও দেখেছেন যে, তার পর ১ দিন ২ দিন অন্তর অন্তর পৃথিবীর নানা স্থানে নানান রকমের দুষ্প্রাপ্য ফল মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হয়েছে। যেমন, এই কলকাতায় গত তিন দিন ধরে অবিশ্রাম ধারায় লিচু, তরমুজ, কালোজাম ঝরে পড়েছে মহাকাশ থেকে। এর আগে, জাপানে "কদলী-বৃষ্টি", অষ্ট্রেলিয়ায় কমলালেবু, আমেরিকায় পেয়ারা ও আম মহাকাশ থেকে নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। বর্তমানে, বিশ্বে যেরূপ খাদ্য-সংকট দেখা

দিয়েছে তাতে এরূপ বৃষ্টি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে মঙ্গল জনক। তথাপি, আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এর স্বরূপ না জানা অবধি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ডক্টর ভাঁর্দো একটু দম নিয়ে পুনরায় শুরু করেন—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এই দেখুন—শিলাবৃষ্টির কথা। আমরা জানি শিলাবৃষ্টি কেন হয়। মৎস্যবৃষ্টিরও ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। অগ্নিবৃষ্টিরও তদরূপ ব্যাখ্যা আছে। এমন কি এই সেদিন যে উল্কাবৃষ্টি হয়েছে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু বর্তমানের এই যে নানারকমের ফলরাজি বৃষ্টির মত মহাশূন্য থেকে ঝরে পড়ছে, এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আর তা সম্ভবই বা কেমন করে? যদি এর সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তবে বলতে হবে মহাকাশে নিশ্চয়ই বৃক্ষ আছে, এবং নানাবিধ ফলের গাছ সমগ্র মহাশূন্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। গাছ ছাড়া ফলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং, মহাশূন্যে সে এই সব ফলের চাষ হয় বা হচ্ছে—সে কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। হয়তো আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে এই সব বৃক্ষরাজি বিদ্যমান। অবশ্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মহাশূন্যে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে গাছ থাকা সম্ভব কি না! এবং ঠিক এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই নির্ভর করছে বর্তমানের অভূতপূর্ব বর্ষণের চাবিকাঠি।'

ডক্টর ভাঁর্দো একটু থামলেন। করতালিতে সমগ্র মণ্ডপটি ভরে উঠলো। মৃদুগুঞ্জনে ভরে উঠল চারিদিক। ধীরে ধীরে উঠে এলেন জার্মান দেশের প্রতিনিধি ডক্টর ওয়েটকার। তিনি বললেন—আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ডক্টর ভাঁর্দো। কিন্তু আমরা সমবেত হয়েছি ঐ চাবিকাঠিরই সন্ধানে। আপনি কি ঐ চাবিকাঠির আসল রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারেন? আপনার যুক্তির সারবত্তা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সমাধানের উপায় আবিষ্কৃত না হলে, প্রকৃতপক্ষে সবকিছু যুক্তিই ভিত্তিহীন। তাই নয় কি?

—"আপনি ঠিকই বলেছেন ডক্টর ওয়েটকার"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন ডক্টর ভাঁর্দো। তারপর বললেন—"আমি সমাধানের উপায়ও একটা স্থির করেছি। আমাদের সমক্ষে তা এখনি পেশ করছি।"

ডক্টর ওয়েটকার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। পুনরায় বক্তৃতা সুরু করলেন ডক্টর ভাঁর্দো—"হ্যাঁ, আমি চাবিকাঠি খুঁজে বার করবার একটা পন্থা আপনাদের কাছে বলবো। হয়তো আমরা সফলকামও হব। হয়তো কেন! আমার স্থির বিশ্বাস আমরা সফলতা লাভ করবই। প্রথমতঃ মৃত্তিকা ছাড়া গাছ হওয়া সম্ভব নয় এবং যথোপযুক্ত সারেরও প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ মহাশূন্যে মৃত্তিকা ও গাছ কোথায় থাকতে পারে? এখন যদি ধরে নেওয়া যায়, যে, কোন এক সুদূর গ্রহ থেকে এই ফলসম্ভার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে তা হলে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে ফলগুলি আসছে কি করে? সুতরাং এর উপর বিশেষ ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। তা যদি না যায় তবে নিশ্চয়ই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে কোথাও না কোথাও শূন্য-উদ্যান-এর অস্তিত্ব আছে এটাই প্রমাণ করে। এবং সেই উদ্যানস্থিত গাছের ফল, বর্ষণ আকারে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যখনই ফল-বৃষ্টি হয়েছে, ঠিক সেই জায়গার আকাশ-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মানে, মেঘ যেমন বৃষ্টিধারায় ভরিয়ে দেয় পৃথিবীর বুক, তেমনি মেঘই আবার বৃষ্টির পরিবর্তে ভরিয়ে দিচ্ছে ফলের বৃষ্টি ঝরিয়ে। আমার কাছে এমন কোন নজির নেই যাতে, শূন্য মহাকাশ থেকে আম, জাম, লিচু নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের পাড়ি দিতে হবে মহাশূন্যে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে চতুর্দিকের পরিস্থিতি। মেঘের উপরিভাগে ক্রমাগত পাহারা দিতে হবে আকাশ-যানে চেপে। আর এইরূপ অদ্ভুত বৃষ্টি হওয়া মাত্রই

সংশ্লিষ্ট দেশ সঙ্গে সঙ্গে তার নিকটস্থ আকাশ-যানে সেই খবরটি প্রেরণ করে দেবেন। আমার মনে হয়, এই ব্যবস্থার ফলে নিশ্চয়ই আমরা এর সঠিক কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হব।"

তুমুল করতালি ধ্বনিতে সভাস্থল গম গম করতে লাগলো। ডক্টর ভাঁর্দো অভিনন্দিত হলেন সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। প্রফেসর বাট্‌লার উঠে এসে ডক্টর ভাঁর্দোর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—"সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এত বিশদভাবে চিন্তা করিনি। ডক্টর ভাঁর্দো আমাদের চোখ খুলে দিলেন। আশা করি, এঁর বর্ণিত উপায় অনুসরণ করেই আমরা এই পরিস্থিতির একটা সুরাহা করতে পারবো। সকল রাজ্যের সরকারগণ যেন এই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করেন আমি তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

প্রফেসর বাট্‌লারের অনুরোধে মুহূর্ত মধ্যেই ডক্টর পাল অন্যান্য বিদেশী রাজ্য সকলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এই সম্মেলনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। সকলেই একবাক্যে সে প্রস্তাবের সমর্থন জানালেন। এবং নিজ নিজ দেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হলেন।

প্রফেসর বাটলার পরিশেষে ঘোষণা করলেন, "তা'হলে আপাততঃ এই ঠিক হ'ল যে, আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করতে থাকবো। আর এই কলকাতায় ডক্টর পালের বাড়ীই হবে এই অভিযানের হেড কোয়ার্টার। যাবতীয় খবরাখবর ডাক্তার পালের মাধ্যমেই যাতায়াত করবে। এবং নির্দেশ এখান থেকেই প্রেরিত হবে কাকে কি করতে হবে। আশা করি, আপনাদের সম্মতি আছে?"

সকলেই একযোগে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। হঠাৎ বাইরে একটা কল-কোলাহল শোনা গেল। সদস্যরা সকলেই বাইরের দিকে তাকালেন। একজন ছুটতে ছুটতে ভিতরের দিকে আসছে দেখা গেল। তার দু'হাত ভর্তি ধান। ডক্টর পালের কাছে এসে তিনি

ধানগুলি সম্মুখস্থ টেবিলের ওপর রেখে বললেন—"দেখুন, দেখুন ডক্টর পাল, আকাশ থেকে অঝোর ধারায় ধান-বৃষ্টি হচ্ছে! এতক্ষণে বোধ হয় সারা গড়ের মাঠ ভরে গেছে। যাগ্‌গে বাবা। এতদিনে অন্নকষ্ট মিট্‌লো। যা দুর্দিন পড়েছিল। আপনি কি বলেন ডক্টর পাল?"

ভদ্রলোকের কথার জবাব না দিয়ে ডক্টর পাল সদলবলে ছুটে বেরিয়ে এলেন সামিয়ানার বাইরে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অচিন্তনীয়, অভূতপূর্ব! ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে ধান! যেন করুণাময় ঈশ্বর খাদ্যাভাবে নিপীড়িত জনগণকে তাঁর আশীষধারা বর্ষণ করে চলেছেন। বাংলাদেশে, যেখানে কোনদিনই চালের অভাব ছিল না আজ সেইখানে গত বছর থেকে চলেছে দুর্ভিক্ষ-প্রায় অবস্থা। শূন্য থেকে যদি আজ হঠাৎ এমন ধারা ধানের বৃষ্টি না হ'তো তবে হয়তো সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিত কয়েক মাসের মধ্যেই। কিন্তু আজ ভগবানের আশীর্বাদ, সে-দুশ্চিন্তা থেকে বঙ্গবাসীকে মুক্ত করে দিল।

ডক্টর পাল দু'হাত ভরে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন কিছু ধান। উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ করে বললেন—"বন্ধুগণ, এই অভূতপূর্ব বৃষ্টির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যতই সময় লাগুক না কেন, বঙ্গ দেশ যে এক মহা বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলো, এ কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ টন ধান মহাশূন্যে কোথায় যে জমা ছিল, ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে!"

"শুধুই আশ্চর্য নয় ডক্টর পাল"—পাশ থেকে বলে উঠলেন প্রফেসর বাটলার—"ব্যাপারটা চিন্তা করে মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠছে। হাওয়ায় কখনও ফসল জন্মাতে পারে না ডক্‌টর পাল। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রাণে শান্তি পাবো না।"

সভা ভঙ্গ হলো। প্রতিনিধিরা যে যার দেশে ফিরে গেলেন। আগামীকাল প্রত্যুষেই প্রতিটি রাজ্যের বৈজ্ঞানিকগণ মহাকাশ যানে পাড়ি দেবেন মহাশূন্যে। ডক্‌টর পাল, ডক্‌টর ভাঁদো এবং প্রফেসর

বাটলার থাকবেন কলকাতায় ডক্টর পালের ল্যাবরেটরীতে, অন্তরীক্ষে অবস্থিত মহাকাশ যান থেকে সংবাদ সংগ্রহের আশায়। ডঃ পালের ল্যাবরেটরীতে বললে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ছোট্ট মানমন্দির। নিজের হাতে তৈরী গবেষণাগারটি সমস্ত রকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এই আধুনিকতম ক্ষুদ্র গবেষণাগার থেকে সহজেই করা যায়। তার জন্যে অন্য কোন মান-মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ডঃ পাল, ডঃ ভাঁর্দো এবং প্রফেসর বাট্‌লার তিনজনে প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকেন সংবাদের আশায়। পৃথিবীর উপরিভাগে সর্বত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েন সুশিক্ষিত বৈমানিকের দল। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণে রইলেন কয়েকজন করে বৈজ্ঞানিক। আর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বিমান-বহর নিজের নিজের দেশের ওপর। কিন্তু কোন সংবাদই কেউ সরবরাহ করতে পারলো না।

ক্রমে ক্রমে একদিন একদিন করে চারদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ডঃ ভাঁর্দো হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁর প্ল্যান অনুযায়ীই যত কিছু আয়োজন করা হয়েছে। যদি এতে বিফল হতে হয় তবে বিজ্ঞানী মহলে তাঁর মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠবে।

ডঃ পাল সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে ডঃ ভাঁর্দোকে বল্‌লেন—"মুস্‌ড়ে পড়ার কিছু নেই ডঃ ভাঁর্দো। আমরা যদি এ সমস্যার সমাধান করে উঠতে না-ই পারি, তাতে কোনই দুঃখ নেই। ভেবে দেখুন, বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা কি ভয়ানক হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করে চলেছে। প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগে কোন দেশেই আজ শস্যফলন উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে না। বিশেষ করে চেয়ে দেখুন আমাদের এই ভারতের দিকে। সেখানে ৫০ কোটিরও উপরে মানুষ সেখানে বড় জোর তিন থেকে চার মাসের মত খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে। ভারতের বাইরে থেকে যে খাদ্য, আমদানি করা

যাবে, তারও তেমন কোন আশা নেই। কারণ, প্রতিটি দেশেই আজ খাদ্য ঘাট্‌তির দিকে। উদ্বৃত্ত খাদ্যভাণ্ডার না থাকলে কেই বা আর সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে?"

—"খুবই সত্য কথা বলেছেন ডঃ পাল—" প্রঃ বাট্‌লার সায় দেন।

—"সুতরাং"—ডঃ পাল বলে চলেন—"এইরকম দুর্দিনে যে কোন অলৌকিক উপায়েই হোক খাদ্য-বৃষ্টি পৃথিবীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে বা আংশিক করেছেও।"

—"আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত ডঃ পাল—" স্বীকার করেন ডঃ ভাঁর্দো।—আর ও বলেন,—"কিন্তু এর রহস্য উদ্‌ঘাটন আমাদের করতেই হবে প্রফেসর বাট্‌লার; কেন না—"

ডাঃ ভাঁর্দোর কথা শেষ হয় না। হঠাৎ সঙ্কেত আসে ইজিপ্টের বিমান বহরের কমাণ্ড্যাণ্টের কাছ থেকে—"হ্যালো নট্‌ নট্‌ টু ফোর্‌। হ্যালো, আমি সেলিম কথা বলছি। আমার কথা কি শুন্‌তে পাচ্ছেন।"

—"পাচ্ছি মিঃ সেলিম্‌। বলুন, কি খবর?"—ডাঃ ভাঁর্দো জিজ্ঞাসা করেন।

—"কিছুক্ষণ আগে কায়রো সহরের ওপর তরমুজ বৃষ্টি হবার সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন হদিস পাচ্ছি না।"

—"বেশ। আরও কড়া করে নজর রাখুন। কোন কিছুর সন্ধান পেলেই জানাতে দেরী করবেন না।"

—"আচ্ছা, স্যার।"

—"ধন্যবাদ।"

পরমুহূর্তেই প্রঃ বাট্‌লার কায়রোয় অবস্থিত আরব সাধারণ তন্ত্রের মূল ঘাঁটিতে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এবং তিনি ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ নাদিরকে তিরস্কৃত করলেন।

প্রথমেই, কোন সংবাদটি ভারতের মূল ঘাঁটিতে পরিবেশন করা হয় নি বলে। নিয়মানুযায়ী, পর্যবেক্ষণকারী বিমানবহরগুলিকে নির্দেশ দান করবার ক্ষমতা একমাত্র ডঃ পালের মান-মন্দিরে উপস্থিত বৈজ্ঞানিকগণেরই আছে। সেক্ষেত্রে কায়রোস্থিত ঘাঁটি বিনা অনুমতিতে কমাণ্ডার সেলিমকে কি করে নির্দেশ প্রেরিত করলো ?

ডাঃ নাদির নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—'কিছু মনে করবেন না প্রফেসর ; আমি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কিছু চিন্তা করার আগেই কমাণ্ডার সেলিমকে দ্রুত আহ্বান জানিয়ে ছিলাম, যদি কিছু কিনারা করা যায়। আমায়, আশা করি ক্ষমা করবেন প্রফেসর বাটলার। ভবিষ্যতে আর এরকম মারাত্মক ভুল হবে না।"

—"ধন্যবাদ। ডঃ নাদির"—বলেই প্রঃ বাটলার সুইচ অফ্ করে দিলেন।

এইসময়ে ডঃ পালের কন্যা অনুরাধা চা'য়ের ট্রে নিয়ে হাজির হলে, সবাই চা পানে মেতে উঠলেন।

অনুরাধা ডঃ ভাঁর্দোর কাপে এক চামচ চিনি দিতে দিতে বললো—"কি ভাঁর্দো কাকা, কিছু কিনারা হোল ?"—

—"না, মা, এখনও পর্যন্ত চেষ্টায় আছি। তবে, এটা ঠিক জেনো। আমরা এর প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রবই"—দৃঢ়ভাবে ডঃ ভাঁর্দো অনুরাধার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

এমন সময়ে আবার সঙ্কেত এলো। বেশী দূর নয়। পাটনা থেকে। ডঃ ভাঁর্দো ছুটে গেলেন রেডিও রিসিভারের কাছে। পাটনায় অবস্থিত ঘাঁটির কর্মাধ্যক্ষ ডঃ প্রসাদ খবর দিলেন।

—ভীষণভাবে গম ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। যত শীঘ্র পারেন পর্যবেক্ষণকারী বিমানগুলিকে পাঠিয়ে দিন।—ডঃ প্রসাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

—"উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই ডঃ প্রসাদ।" ডঃ ভাঁদো

ধীর স্বরে বলেন—"আমরা এখান থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। আপনি নজর রাখুন।"

ডঃ ভাঁর্দো মুহূর্তের মধ্যে পর্যবেক্ষণকারী বিমানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নির্দেশ দিলেন দ্রুতগতিতে পাটনার ওপর গিয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে।

কিছুক্ষণ পর ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"অত্যন্ত দুঃখিত স্যার্। কিছুই নজরে পড়ছে না। বুঝতে পারছি না এখনও গম-বৃষ্টি হচ্ছে কি না!"

—"আচ্ছা। ঠিক আছে।"— গম্ভীর গলায় ডঃ ভাঁর্দো উত্তর দেন।

ডঃ ভাঁর্দোর মাথা ঘুলিয়ে যায়। কিছুতেই কোন কিছু সূত্র পাওয়া যায় না এই অত্যদ্ভুত পরিস্থিতির। চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন তিনি।

প্রঃ বাটলার এবং ডঃ পালও চিন্তামগ্ন চিত্তে বসে থাকেন। পরবর্তী কর্মপন্থা কি হবে? আর কি উপায়েই বা এর রহস্য ভেদ হবে?

অনুরাধা এঁদের উদ্ধার করে চিন্তার হাত থেকে। অনুরাধা বললে—"আমার মনে হয় এ ভাবে আপনারা চেষ্টা না করে বরং কিছু উপগ্রহ ছেড়ে দিন পৃথিবীর চতুর্দিকে। আর টেলিভিশন মারফৎ নজর রাখুন মহাকাশের দিকে। হয়'তো কিছু পেয়ে যেতেও পারেন।"

—"দি আইডিয়া"—লাফিয়ে ওঠেন প্রঃ বাটলার।

চমক্ ভাঙে ডঃ ভাঁর্দোর।

প্রঃ বাটলার বলেন—"ঠিক বলেছ, মা, অনুরাধা। আমরা এখন এই পথেই চেষ্টা করে দেখবো।"

প্রঃ বাট্‌লারের নির্দেশে সমস্ত দেশের বিমানবহর তুলে নেওয়া হোল। পরিবর্তে, মহাকাশে ছেড়ে দেওয়া হ'ল কতকগুলি উপগ্রহ।

ডাঃ পালের মানমন্দিরে সকলে উদগ্রীব হয়ে বসে রইল টেলিভিশনের পর্দার সামনে। উপগ্রহগুলি নিজস্ব কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো।

আশ্চর্য ব্যাপার! আম, জাম, লিচু, ধান সব কিছুই যেন বন্ধ হয়ে গেল। আর কিছুই মহাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে না পৃথিবীর বুকে। সগর্বে উপগ্রহগুলি পাক খেয়ে চললো তাদের কক্ষপথে। কোন দেশ থেকেই আর কোনও বিশেষ সংবাদ এলো না ডঃ পালের মানমন্দিরে। তথাপি হাল ছাড়ার পাত্র ডঃ ভাঁর্দো নন। একনিষ্ঠ চিত্তে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন প্রতিটি টেলিভিশন পর্দার উপর। হঠাৎ কি যেন একটা চক্ চক্ করে জ্বলে উঠলো সুদূর মহাকাশে চার নম্বর উপগ্রহের অদূরে। ডঃ ভাঁর্দো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে। মনে হোল উজ্জ্বল পদার্থটি যেন উপগ্রহটির দিকেই এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্ত। ব্যাস্। তারপরেই টেলিভিশন স্ক্রীনটা সাদা হয়ে গেল। ডঃ ভাঁর্দোর বুঝতে বাকী রইল না যে চারনম্বর উপগ্রহটি চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মহাকাশ থেকে।

প্রঃ বাট্লার এবং ডঃ পালও এসে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ ভাঁর্দোর পিছনে। তাঁরাও এই অদ্ভুত জিনিষটা লক্ষ্য করছিলেন। সকলেই নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ডঃ ভাঁর্দো তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করলেন—"এ নিশ্চয়ই কোন মানুষের কাজ। সে পৃথিবীর মানুষও হতে পারে অথবা অন্য কোন গ্রহের অধিবাসী হওয়াও বিচিত্র নয়।"

"আপনার কথাই সত্য বলে মনে হচ্ছে"—বললেন ডঃ পাল —"কেননা ঐ দেখুন, দশ নম্বর উপগ্রহটিও নিশ্চিহ্ন হয়েছে— টেলিভিশনের পর্দা থেকে।"

—"কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না। নিজেকে অজ্ঞাত রেখে পৃথিবীর উপকার করার কি কারণ থাকতে পারে? এ কথাটা

পরিষ্কার বোঝা গেল, যিনি এই অত্যদ্ভুত বৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, তিনি নিজেকে গোপন রাখতে চাইছেন, তা না হলে, আমাদের প্রেরিত উপগ্রহগুলিকে ধ্বংস করতেন না"—সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলেন প্রঃ বাট্‌লার।

এঁরা লক্ষ্য করলেন, একে একে সবগুলি উপগ্রহ মুছে গেল স্ক্রীন থেকে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের আর কোন সুযোগই রইল না ডঃ পালের মান-মন্দির থেকে।

শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনজনে ঠিক করলেন, এ রহস্যের সমাধান করতে হলে, সকলকে সশরীর রওনা হতে হবে মহাকাশের দিকে এবং তদনুযায়ী কাল বিলম্ব না করে এঁরা ছুটলেন মহাকাশ-যানের ঘাঁটির দিকে।

একটি অতি আধুনিক রকেট-যান সঙ্গে সঙ্গে এঁদের নিয়ে ছুটলো মহাকাশের দিকে। প্রঃ বাটলারের ইচ্ছানুযায়ী রকেট-যান সৌর-মণ্ডলের প্রতিটি গ্রহ ঘুরে ঘুরে যাবে। যদি সৌর-মণ্ডলের কোনও গ্রহ থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায়। প্রথমেই ঠিক হ'ল, রকেট-যান চাঁদে অবতরণ করবে এবং চতুর্দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে যাত্রা করা হবে মঙ্গল গ্রহের দিকে। যাতে কোন কিছুই দৃষ্টির অগোচরে না থাকে সেইভাবে প্রতিটি জিনিষের উপর নজর রাখতে হবে। পালা করে তিনজন বৈজ্ঞানিক প্রহরা দিতে লাগলেন।

রকেট-যান পৃথিবী থেকে চন্দ্রের অর্ধেক পেরিয়ে আসার পর ডঃ পাল দেখলেন বহুদূরে একটা যেন কিছু উজ্জ্বল পদার্থ চক্ চক্ করে জ্বলে উঠলো। তিনি চিৎকার করে ডঃ ভাঁর্দো এবং প্রঃ বাট্‌লারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

"যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই"—প্রঃ বাট্‌লার বলে উঠলেন—"আমাদের এই অভিযানকে ব্যর্থ করতে অদৃশ্য শত্রু তার অস্ত্র প্রয়োগ করবে, তা আমি পূর্বেই বুঝেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি না এত গোপনীয়তা অবলম্বনের কারণ কি? যাই হোক আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে প্রতিটি আক্রমণকে।"

তিনি মুহূর্তমধ্যে রকেট-যানে অবস্থিত বৈদ্যুতিক জেনারেটরটি চালু করে দিলেন। এবং একটা বোতাম টিপে ধরলেন। একটা সরু বর্শা ফলকের মত তামার পাত বেরিয়ে এলো রকেট-যানের গা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! উজ্জ্বল পদার্থটি এগিয়ে এসে আছড়ে পড়লো রকেট-যান লক্ষ্য করে। প্রঃ বাট্‌লার দেখলেন রকেট-যানের অভ্যন্তরস্থ বৈদ্যুতিক আধারে জমা হোল ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি। মিটারের কাঁটা ঘুরে গিয়ে জানিয়ে দিল, উজ্জ্বল পদার্থটি আর কিছুই নয় ৫০০০ মেগাওয়াট শক্তির মারণাস্ত্র মাত্র।

ডঃ পাল বললেন—"ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগছে যে, মহাকাশে লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে আমাদের অদৃশ্য শত্রু কি ভীষণ শক্তির অধিকারী! জানি না এর পর কিভাবে তার আক্রমণ আসবে।"

"আমার মনে হয় আর আস্‌বে না, ডঃ পাল"—শান্ত কণ্ঠে জানালেন প্রঃ বাট্‌লার।

ডঃ ভাঁর্দো সায় দিয়ে বললেন—"আমারো তাই মনে হচ্ছে, কেন না বজ্রশক্তি হেনে আমাদের অদৃশ্য শত্রু এক রকম নিশ্চিত যে, আমরা ভস্মীভূত হয়ে গেছি তার আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে। মনে হয় সে এখন নিশ্চিন্ত মনে আবার নিজের কাজে মনসংযোগ করবে।"

"কিন্তু"—ডঃ পাল বলেন,—"যে শত্রু আমাদের কাছে অদৃশ্য থেকে আমাদের উপর নিখুঁত ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র বা বজ্রাঘাত হানতে পারে, সেকি জানতে পারবে না যে আমাদের রকেট-যান বেশ বহাল তবিয়তে নিরাপদ মহাকাশ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে?"

"তাও বটে"—চিন্তিত মুখে বলেন প্রঃ বাট্‌লার—"তবে, যদি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে কোন আক্রমণের অভাষ না পাওয়া যায়, তবে বুঝবো আমার ধারণাই অমূলক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নিজের শক্তির গর্বে এবং অহমিকায় অন্ধ হয়ে যায় এই সব শক্তিধরেরা। তাই, বজ্রশক্তি হানার পর সে স্থির নিশ্চিত যে আমাদের রকেট-যান পুড়ে

ছাই হয়ে গেছে। এবং সেই কারণেই, এই তুচ্ছ ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে রাজি হবে না।"

সত্যি সত্যিই আর কোন প্রতিবন্ধক দেখা দিল না। রকেট-যান সবেগে ধেয়ে চললো আপন গন্তব্যস্থলে।

চাঁদের সীমানায় এসে উপস্থিত হ'ল তারা। খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করে দেখতে পেল কয়েকটি পিরামিড আকারের স্তূপ। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল চাঁদের দেশে পিরামিডের অস্তিত্ব দেখে। দূরবীনের লেন্সের ভিতর দিয়ে বারে বারে সবাই দেখতে লাগলো পৃথিবীর মিশরীয় পিরামিডের অস্তিত্ব সুদূর চাঁদের দেশে। আজ পর্যন্ত যত অভিযান হয়েছে, তাদের কোন রিপোর্টেই এরকম একটা কিছুর আভাস নেই। যাই হোক্, ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতে রকেট-যানকে নামাবার নির্দেশ দিলেন প্রঃ বার্টলার। ধীরে ধীরে তাঁরা এসে নামলেন পিরামিডের পাদদেশে।

অবাক কাণ্ড! পিরামিডগুলি আসলে বড় বড় গুদাম ঘর। তিন বৈজ্ঞানিক বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকেন পিরামিডগুলির দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সকলে পর্যবেক্ষণ শুরু করেন একটির পর একটি পিরামিড। কোনটায় গম, কোনটায় চাল, কোনটায় তরমুজ, কোনটায় আম, ইত্যাদি করে প্রতিটি পিরামিড ভর্তি। অফুরন্ত খাদ্য-ভাণ্ডার।

মুখ খুললেন ডঃ ভাঁর্দো—"এতক্ষণে বুঝলাম কোন্‌খান থেকে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে এইসব দুষ্প্রাপ্য খাদ্য। আমি বলে ছিলাম, বোধ হয় মনে আছে ডঃ পাল, যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন মানুষের অদৃশ্য হাত আছে। তা না হলে মহাশূন্য থেকে ফসল ঝরা কোনমতেই সম্ভব নয়।"

—"তা ঠিক ডঃ ভাঁর্দো। কিন্তু এই সব ফসলের ফলন তো চাঁদে সম্ভব নয়। আপনি চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে দেখুন। বালি আর পাথরে ভরা। এখানে এই বিশাল খাদ্য-ভাণ্ডার—যা

আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি—চাষ করে সঞ্চয় করা একেবারেই অসম্ভব।"

ডঃ ভাঁর্দো মাথা চুলকাতে থাকেন। কথাটা নেহাৎ ভুল বলেন নি ডঃ পাল। চাঁদের মাটিতে ফসল তো দূরের কথা; একটুকরো ঘাসের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ধূ ধূ করছে মরুভূমি।

প্রঃ বাটলার সমস্যার সমাধান করলেন—"এতে অত চিন্তার কিছুই নাই ডঃ পাল। ধরে নেওয়া যাক্ চাঁদকে একটা মধ্যবর্তী খাদ্য-ভাণ্ডার-ষ্টেশন করা হয়েছে। অন্য কোনও গ্রহ থেকে খাদ্য আমদানী করে এখানে জড়ো করা হচ্ছে এবং তারপর কোনও এক উপায়ে এইগুলিকে সরাসরি পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তাতে সুবিধা এই যে চাঁদ একটি উপগ্রহ এবং পৃথিবীর খুবই সন্নিকটে। তবে, এটা সুখের বিষয় যে, আমরা সফলকাম হয়েছি এবং আমরা এর শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রবো।"

অবশেষে, বহু যুক্তি এবং চিন্তার পর তিনজনে স্থির করলেন যে, ডঃ ভাঁর্দো আপাততঃ চন্দ্রে অবস্থান করবেন। প্রঃ বাটলার এবং ডঃ পাল রকেট যানে করে চন্দ্রের সীমানার বাইরে অপেক্ষা করবেন। ডঃ ভাঁর্দো নূতন কিছু দেখতে পেলে তা জানিয়ে দেবেন রকেট-যানে এবং তদনুযায়ী পরের কর্তব্য স্থির করা হবে।

ডঃ ভাঁর্দো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। রকেট-যান নিমেষে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যের বুকে। তিনি এখন একা। সম্মুখে বিরাট খাদ্য-সম্ভার। আস্তে আস্তে তিনি গমের কুঠুরিতে ঢুকলেন। বিরাট একটা হল-ঘরের মধ্যে এসে তিনি যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। এত বড় হল-ঘর পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারেনা এমনই তার বিস্তার এবং উচ্চতা। অথচ নম্র এবং মিষ্টি এক অপূর্ব জ্যোতিতে সারা হল-ঘর আলোয় আলোকিত। ডঃ ভাঁর্দো এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। চতুর্দিকে রাশিকৃত গম ঢালা রয়েছে ছোট ছোট

পাহাড়ের মত। চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ে দূরে ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা ঘর। স্বচ্ছ স্ফটিকের দ্বারা চারিদিক আবৃত। অবাক বিস্ময়ে ডঃ ভাঁর্দো লক্ষ্য করলেন—কয়েকজন লোক তার ভিতরে যেন কোনও বিশেষ জিনিষ আগ্রহ সহকারে দেখতে ব্যস্ত। তিনি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন ঘরের পাশে। মনের ভিতর তোলপাড় করে উঠলো ডঃ ভাঁর্দোর "এরা কি তবে চন্দ্রের অধিবাসী! তা'হলে চাঁদে মানুষ সত্যি সত্যিই বাস করে? নানারূপ প্রশ্ন এবং দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ডঃ ভাঁর্দোর মনে। তা'হলে আমাদের অতীতে শত শত অভিযানের মধ্যে কি একবারও চাঁদের মানুষের দেখা পাওয়া যেতো না?" ডঃ ভাঁর্দো, সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে যান ঘরের দরজার দিকে। দরজার সম্মুখে আসামাত্রই দরজাটা খুলে যায় ডঃ ভাঁর্দোর সামনে। তারপর। বজ্রাঘাতেও বোধ হয় মানুষ এতটা হতচেতন হয় না। ডঃ ভাঁর্দোর অবস্থা তদরূপ করে দিয়ে গম্ভীর অথচ কোমল স্বরে কে যেন বলে উঠল—"নমস্কার ডঃ ভাঁর্দো, আপনার অপেক্ষাতেই আমরা বসে আছি। এগিয়ে আসুন—।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত ডঃ ভাঁর্দো এগিয়ে গেলেন লোকগুলির দিকে। তারপরেই চমকে উঠে বললেন—

—"আপনি—।"

—"হ্যাঁ, আমিই। চিনতে তা'হলে কষ্ট হয়নি আপনার—"

—"ডঃ কুণ্ড! আপনি আপনি এখনও জীবিত! আশ্চর্য! অথচ—"

—অথচ আমি বহাল তবিয়তে চন্দ্রবাসী। তাই না?—ডঃ কুণ্ড বলেন।

"শুনুন্ ডঃ ভাঁর্দো"—তিনি বলতে থাকেন—"শুধু আপনি কেন, সারা বিশ্ববাসী যখন শুনবে যে আমি বেঁচে আছি তখন তারাও কম বিস্মিত হবে না।"

—"কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে, আমি এখানে এসেছি ডঃ কুণ্ড?"

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন ডঃ কুণ্ড। হাত নেড়ে ডঃ ভাঁর্দোকে ডাক্‌লেন---"এগিয়ে আসুন ডঃ ভাঁর্দো, দেখুন কি করে আপনাদের অবস্থান আমার নখ-দর্পণে। আসুন্। একটু এগিয়ে আসুন।"

ডঃ ভাঁর্দো ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যান টেবিলটির দিকে। বুঝতে কষ্ট হয় না কি করে ডঃ কুণ্ড তাদের প্রতিটি কার্যাবলী জানতে পারেন। আসলে টেবিলটা একটা টেলিভিশন স্ক্রীন ছাড়া কিছুই নয়। লোকগুলি এতক্ষণ ওই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডঃ ভাঁর্দোর গতিবিধি লক্ষ্য রাখছিল।

ডঃ কুণ্ডই কথা বললেন—"বুঝতে পারলেন ডঃ ভাঁর্দো কেমন করে আপনাদের অবস্থান টের পাই। আর এটাও জেনে রাখুন আমার ইচ্ছাতেই আপনারা চন্দ্রে অবতরণ করেছেন।"

—"আমরা বলতে কি বোঝাচ্ছেন ডঃ কুণ্ড?"

—"আপনি ভালভাবেই বুঝতে পারছেন, আমি প্রঃ বাটলার ও ডঃ পালের কথাই বলছি।"

—"তারা তো চন্দ্রে নেই ডঃ কুণ্ড।"

—"তা জানি। একবার টেবিলটার দিকে দেখুন"—

ডঃ কুণ্ড একটা সুইচ্ টিপে দিলেন। ভেসে উঠ্‌লো রকেট যানের ছবি। দূর মহাকাশে ভাসমান। ডঃ ভাঁর্দো নির্বাক। ধরা পড়লেও মনের মধ্যে ডঃ ভাঁর্দো'র শান্তি ছিল। আর যাই হোক খাদ্য-সম্ভার পৃথিবীর বুকে যে ভাবেই পতিত হোক, তা মানুষেরই সৃষ্টি। কোন অলৌকিক নয়। ডঃ ভাঁর্দো বললেন—

—"আমরা চাঁদে অবতরণ করি এমন ইচ্ছাই বা আপনি পোষণ করলেন কেন? আমাদের অভিযান যে কারণে সে কারণ তো আমরা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি।"

—"আমারই ইচ্ছায় তা সম্ভব হয়েছে ডঃ ভাঁর্দো। তা না'হলে আপনাদের রকেট-যান মহাশূন্যের বুকে চিরতরে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

—"সে চেষ্টাও কি আপনি করেননি ডঃ কুণ্ড?"

—"ওঃ। আপনি বজ্র-বিদ্যুতের কথা বলছেন। আমি জানতাম প্রঃ বাটলার সব কিছু ব্যবস্থা করেই আসছেন। তাই একটু পরখ করে দেখলাম আপনারা ভয় করেন কি না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, পৃথিবীর মানুষ জানলো না বা কোনদিন জানতেও পারবে না, যদি না স্বেচ্ছায় আমার আবিষ্কারের কাহিনী বলি। তাই ঠিক করলাম আপনাদের জানাবো সব কিছু। দেখাবো কেমন করে পৃথিবীর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানব-সমাজকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আর এটুকুও জানাতে চাই যে, মানব সমাজ যতদিন শান্তিপ্রিয় এবং সহ-অবস্থানের নীতি পালন করবে ততদিন তারা আমার নিকট থেকে অফুরন্ত সাহায্য পেয়ে যাবে। আর যদি দেখি তারা পুনরায় হিংসা, পরশ্রীকাতর, অথবা যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে তবে আমার কঠোর হস্ত তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে পৃথিবীর বুক থেকে।"

—"সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এত বিশাল খাদ্য-ভাণ্ডারের উৎপাদন স্থলটি কোথায়? আমার বিশ্বাস কৃত্রিম উপায়ে নিশ্চয়ই এর সৃষ্টি সম্ভব নয় ডঃ কুণ্ড?"

—"ঠিক কথা ডঃ ভাঁর্দো। চলুন আমার কৃষিক্ষেত্রটি আপনাদের দেখিয়ে আনি।"—ডঃ কুণ্ড দলবলসমেত পিরামিডের বাইরে চলে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি অদ্ভুত আকৃতির আকাশ-যান এসে হাজির হো'ল তাদের সামনে। ডঃ ভাঁর্দোকে নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন আকাশ-যানের অভ্যন্তরে।

ডঃ কুণ্ডর আকাশযান ধাবিত হোল দূর মহাশূন্যের পানে, যেখানে প্রঃ বাটলারের রকেট-যান অপেক্ষা করছে ডঃ ভাঁর্দোর সঙ্কেতের আশায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল রকেট-যানটিকে। ডঃ কুণ্ড একেবারে অত্যন্ত সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন আকাশ-যানে করে। তখন উভয় যানের মধ্যে ব্যবধান রইল শুধু কয়েক গজ মাত্র।

প্রঃ বাটলার অথবা ডঃ পাল এর বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলেন না। তখন তাঁরা কফি খেতেই ব্যস্ত। কেবল ঐটুকু সময়েই তাঁরা আর রকেট-যানের বহির্দেশে নজর রাখতে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই ডঃ কুণ্ড'র আকাশ-যান এসে হাজির হ'ল একেবারে রকেট-যানের দরজার সামনে। অকস্মাৎ কার কণ্ঠস্বরে উভয়ে চমকে উঠলেন। আশ্চর্য! রকেটের ভিতর আর তো কেউ নাই! তবে—

—"সুস্বাগতম্ প্রঃ বাটলার; সুস্বাগতম্ ডঃ পাল"—অদৃশ্য কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে—"আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই, আপনারা যখন চাঁদে নেমে আমার শস্য-ভাণ্ডার দেখছিলেন, সেই অবসরে আমি রকেটের ভিতর ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি স্থাপন করে এসেছিলাম। যাই হোক্, আপাততঃ আপনারা আমার অতিথি, দয়া করে আমার আকাশ-যানে চলে আসুন। ডঃ ভাঁর্দো আপনাদের প্রতীক্ষায় আছেন।"

—"কিন্তু, আপনি কে, তা জান্‌তে পারি কি?"—ডঃ পাল জিজ্ঞাসা করেন।

—"এসেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করুন ডঃ পাল।"

—"আপনি নিশ্চয়ই রসিকতা করছেন। আপনি যেই হ'ন বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। না'হলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন না।"

—"ভুল বুঝবেন না ডঃ পাল, আপনি ডঃ ভার্দোর মুখ থেকেই তা'হলে শুনুন।"

—"আমি ডঃ ভাঁর্দো বলছি। আপনারা স্বচ্ছন্দে মহাকাশের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে আমাদের আকাশ-যানে আসতে সক্ষম। এতে এতটুকুও অতিরঞ্জিত করা নাই ডঃ পাল।"

—"ঠিক বুঝতে পারলাম না ডঃ ভাঁর্দো?"—অবিশ্বাসের সুরে বলেন প্রঃ বাটলার।

—"অবিশ্বাসের কারণ নেই প্রফেসর। আপনি রকেট-যানের দরজা খুলুন, আমরাই হাজির হচ্ছি আপনার কাছে।"

সংশয় দোলায় দোদুল্যমান প্রঃ বাটলার রকেট-যানের দরজা খুলে দিলেন। এবং তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে যা ঘটলো, তা না দেখলে তিনি নিজেই হয়তো বিশ্বাস করতেন না। তিনি দেখলেন, আকাশ-যানের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে দুইটি মনুষ্যমূর্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন রকেট-যানের দিকে। মহাশূন্যে পদচারণা। প্রঃ বাটলারের কাছে একরূপ অকল্পনীয়। স্বপ্ন বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাটির উপর মানুষ যেমন নির্ভয় নিরাপদে হেঁটে চলে বেড়ায়, এঁরাও ঠিক তেমনি ভাবেই এগিয়ে আসছে রকেট-যান অভিমুখে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আগন্তুকরা এসে পৌঁছায় রকেট-যানে। রকেট যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রেই ডঃ কুণ্ড এবং ডঃ ভাঁর্দো মস্তকের শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন।

প্রঃ বাটলার এবং ডঃ পাল উভয়েই অবাক হয়ে বলে উঠলেন—"ডঃ কুণ্ড! আপনি!!"

—"হ্যাঁ, আমিই প্রফেসর। আমার সাধনার ফল, আপনাদের দেখাবার জন্যেই হাজির হয়েছি এখানে।"

—"কেমন করে সম্ভব ডঃ কুণ্ড? কি করে আয়ত্ত করলেন মহাশূন্যে চলার ক্ষমতা?"—প্রঃ বাটলারের বিস্ময় ফেটে পড়ে।

—"সবই বল্‌বো প্রফেসর, এখন আসুন আমার ক্ষেত খামার একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি। আসুন।"

সকলেই অবলীলাক্রমে মহাশূন্যের মাঝে দুই যানের মধ্যখানের সেতু দিয়ে পার হয়ে পৌঁছলেন আকাশ-যানে। প্রঃ বাটলারের মনে হল তিনি যেন অত্যন্ত নরম মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। আশ্চর্য বৈজ্ঞানিকের আশ্চর্য সৃষ্টি অভিভূত করে ফেলে প্রঃ বাটলার'কে। যতই ভাবেন ততই বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। শ্রদ্ধায় প্রঃ বাটলারের মস্তক নত হয়ে আসে ডঃ কুণ্ডর কাছে।

আকাশযান নিমেষে উধাও হয় ডঃ কুণ্ডর কৃষিক্ষেত্রের দিকে। সীমাহীন অনন্ত আকাশের বুকে ভেসে ওঠে ডঃ কুণ্ডর কৃষিক্ষেত্র। সবিস্ময়ে আগন্তুক বৈজ্ঞানিক দল লক্ষ্য করলেন, একটি ভাসমান কৃষিক্ষেত্র বিরাজ করছে মহাকাশের বুকে। শত শত মাইল বিস্তার এই কৃষি ক্ষেত্রের। পৃথিবীর আকাশে যেমন মেঘ বেড়ায় ভেসে, তেমনি ভাবে এই বিরাট কৃষিক্ষেত্রটি ভাসমান। আকাশ-যানটির গতি শ্লথ হয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে চলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের উদ্দেশে।

ডঃ কুণ্ড দেখাতে থাকেন আগন্তুক বৈজ্ঞানিক দলকে। —"এই দেখুন আমার ধান ক্ষেত। আর ঐ যে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত সবুজ জঙ্গল ওটা আমার আম্র কুঞ্জ। দেখুন এবার আমরা চলেছি তরমুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে"—

"আপনি নমস্য ডঃ কুণ্ড"—বলেন ডঃ পাল। "কিন্তু এই ভাসমান কৃষিক্ষেত্রের সন্ধান পেলেন কি করে? আর চাষ করেনই বা কেমন করে? দয়া করে যদি আমাদের কৌতূহল নিবারণ করেন খুবই আনন্দিত হ'ব ডঃ কুণ্ড।"—

"নিশ্চয়, নিশ্চয় ডঃ পাল, অবশ্যই আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করবো"—মৃদু হেসে জবাব দেন ডঃ কুণ্ড।

পরিপূর্ণভাবে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণের পর আকাশ-যান সকলকে নিয়ে ফিরে এলো চাঁদে। সবাই আকাশ-যান থেকে অবতরণ করে ফিরে এলেন সেই ঘরে, যেখানে প্রথম ডঃ ভাঁর্দোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ডঃ কুণ্ডর।

সকলে এসে বসলেন একটি সাজানো টেবিলের চতুর্দিকে। ডঃ কুণ্ড অতিথি আপ্যায়নে মনোযোগ দিলেন। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কথা পাড়লেন ডঃ ভাঁর্দো—বললেন,—"ডঃ কুণ্ড আপনার ভাসমান কৃষিক্ষেত্রে দেখে আমরা প্রকৃতপক্ষে নির্বাক হয়ে গিয়েছি। কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না কেমন করে এত বিরাট এক কৃষি

ক্ষেত্র সম্ভব। অথচ স্বচক্ষে যা দেখে এলাম তা অমূলক বলে পরিত্যাগও করতে পারছি না।"

কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ডঃ ভাঁর্দোর দিকে তাকিয়ে থেকে সুরু করলেন ডঃ কুণ্ড।—বললেন, "শুনুন প্রঃ বাটলার, ডঃ পাল এবং ডঃ ভাঁর্দো, আপনারা জানেন আজ থেকে ২০ বছর আগে আমি পৃথিবী থেকে নিরুদ্দেশ হই। আমারই তৈরী মহাকাশ-যানে করে পাড়ি দিলাম সীমাহীন অনন্তের বুকে। কেন? পৃথিবীতে ফেরার ইচ্ছা কোঁটাও ছিল না। মরতে হয়, মরবো মহাশূন্যের মাঝখানে, লাভ করবো অনন্ত সমাধি। নিজের মন নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছে। তার উত্তরে সে পেয়েছে, এ ছাড়া কোন গতি নাই। হিংস্র পৃথিবী ভুলে গেছে মানবতা বোধ, ভুলে গেছে দেশাত্মবোধ, ভুলে গেছে প্রেম, দয়া, মায়া, সব কিছু। লোভের লালসায় পূর্ণ তাদের অন্তর। পরশ্রীকাতরতায় অন্ধ প্রতিবেশী। সমাজের ভাঙন হয়েছে শুরু। যুদ্ধের তাণ্ডবে নেচে উঠেছে পৃথিবীর মানব জাতি। দেখতে পেলাম দিব্যদৃষ্টিতে পৃথিবীর ছবি। শস্যহীনা পৃথিবী। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। চাষ-আবাদের কথা ভুলে গিয়ে মেতে উঠছে মারণাস্ত্র তৈরীর উৎসবে। তাই বেরিয়ে পড়লাম আমার সাধনার বাস্তব রূপায়নে। জানি না একার পক্ষে কেমন ক'রে তা সম্ভবপর। তথাপি মনের জোরে বেরিয়ে পড়লাম। এলাম চাঁদে। দেখা পেলাম চাঁদের মানুষের।"

—"চাঁদের মানুষের!"—বিস্ময়ে ফেটে পড়েন সকলে। প্রঃ বাটলার বল্লেন—"তা'হলে আপনি কি বলতে চান ডঃ কুণ্ড যে চাঁদেও মানুষের বসতি আছে?"

—"ঠিক তাই, প্রফেসর।"

—"কিন্তু আমরা তো একটিও তেমন মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম না।"

—"কি ক'রে পাবেন প্রঃ বাটলার! মনে করুন, চাঁদের মানুষ যদি পৃথিবীর সাহারা মরুভূমির মাঝখানে নামে। তবে তারা কি

চিন্তা ক'রবে? আপনারা এখন এমন জায়গায় আছেন, যেখানটা ঠিক পৃথিবীর "সাহারা"র মতনই জনহীন এক বিরাট প্রান্তর।"

—"বুঝলাম। তারপর কি হোল আমাদের বলুন"—আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেন ডঃ ভার্দো।

—"হ্যাঁ, তারপর"—ডঃ কুণ্ড পুনরায় বলতে থাকেন—"তারপর এঁদের সাহায্যে আমি আরম্ভ করলাম আমার থিওরীর প্রথম ধাপ। শত শত চন্দ্রবাসী যোগ দিল আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকও যোগ দিলেন এবং আমার চেয়ে তাঁরা আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আপনাদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করানো দরকার। এই যে সম্মুখে বসে আছেন তিনজন, এরাই সেই বৈজ্ঞানিকগণ নাম যথাক্রমে, "ডুডু", "ফুডু" এবং "টুটু"। আর চাঁদের দেশের সবকিছুর উন্নতির মূলেই রয়েছেন এঁরা তিনজন।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বিস্ময়ের মায়াজাল বুনে চলেন ডঃ কুণ্ড। চাঁদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এগিয়ে এসে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানালেন। হতবাক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদল নীরবে শুনতে থাকেন ডঃ কুণ্ডুর কাহিনী।

—"আমার হঠাৎ আবির্ভাবে চন্দ্রবাসীরা প্রথমটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, কিন্তু আমার অভিলাষ প্রকাশ করায় এবং আমার তরফ থেকে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা না থাকায় আমাকে এঁরা চাঁদে প্রধান ঘাঁটি করবার অধিকার দিলেন। আর আমার এই তিন বন্ধু এগিয়ে এলেন আমাকে সহযোগিতা করার বাসনা নিয়ে। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রমে, আমার নির্দেশানুসারে চাঁদে তৈরী হ'ল বিরাট বিরাট শস্যাগার। তৈরী হ'ল বিরাট গবেষণাগার। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের সাধনায় আমার আশা সফল হো'ল। সৃষ্টির এক টুকরো রহস্যকে করায়ত্ত করতে সমর্থ হলাম। আমরা জানি, কোন গ্রহই আবহমান কাল ধরে শস্যশ্যামলা থাকতে পারে না। সৃজনী শক্তির হ্রাস একদিন না একদিন হবেই। যে ধরণীতে আমাদের বাস, তা

এখন যতই শস্যপূর্ণ হোক না কেন এমন একদিন আসবে, তখন দেখা যাবে পৃথিবীময় বিরাজ করছে শুধুই মরুভূমি। পৃথিবী জরার কবলে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় গুন্‌ছে দিন। তখন কি হবে? যদি তখন পৃথিবীতে প্রাণী জগতের অস্তিত্ব থাকে তবে তারা কি ক'রবে? তিলে তিলে একদিন সারা দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রাণের স্পন্দন আর থাকবে না। তাই না ডঃ পাল?"

ডঃ পাল মৌন সম্মতি জানান ঘাড় নেড়ে।

—"কিন্তু তখন যদি অফুরন্ত খাদ্য-সম্ভার নিয়ে কেউ হাজির হয় হয় তাদের সামনে, তা'হলে হয়তো তাদের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যোপযোগী একটা গ্রহের সন্ধান করে একটি নূতন উপনিবেশেরও পত্তন করা যেতে পারে মানব কল্যাণের জন্যে। গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির আদিতে চলে গেলাম। দেখলাম একটি গ্রহের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য গ্রহের। দূর নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে দেখি সৃষ্টি-রহস্যের মায়াজালে ঘেরা। পিণ্ড পিণ্ড গ্যাস কালক্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে গ্রহে এবং উপগ্রহে। বিবর্তনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ ক'রছে পরিপূর্ণতায়। কিন্তু এই বিবর্তনের ধারাকে যদি ত্বরান্বিত করা যায় তবে নিশ্চয়ই তার ফলও হবে ত্বরান্বিত। আবিষ্কার ক'রলাম "কুইক্ এভোল্যুশন মেশিন।" যার মাধ্যমে বা যার সহায়তায় সৃষ্টি হয়েছে আমার কৃষিক্ষেত্র। যার সহায়তায় সৃষ্টি করেছি মহাশূন্যে যাতায়াতের নির্বিঘ্ন রাস্তা।"

—"অসম্ভব" —চিৎকার করে ওঠেন ডঃ ভাঁর্দো।

—"চাক্ষুষ দেখেও এই কথা উচ্চারণ করতে পারলেন ডঃ ভাঁর্দো? আপনি একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হয়ে কি ক'রে ভাবতে পারলেন এ কথা!

লজ্জায় ডঃ ভাঁর্দো কেঁচো হয়ে যান, ডাঃ কুণ্ডুর কাছে তার এই প্রগলভতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ডঃ কুণ্ডু বলতে থাকেন—"তারপর ছুটলাম জায়গা নির্বাচনের

জন্য। কোথায় হবে আমার আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। মহাশূন্যে ভাসমান একটি নবসৃষ্ট ক্ষেত্র। যদি চাঁদকেই মূল ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তবে চাঁদের নিকটবর্তী কোন স্থানকেই নির্বাচিত করতে হয়। আর একটি সমস্যার চিন্তা আছে সেটা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। আমার চাষের জমির উপর তার প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। না হ'লে কর্মীরা জমিতে কাজ করবে কেমন করে। ফসল ঊর্ধমুখী হবে কি উপায়ে। স্থির করলাম, চাঁদের উপগ্রহ হিসাবে স্থাপন করতে হবে আমার কৃষিক্ষেত্রটিকে। ধীরে ধীরে সে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে। আর কতকগুলি শক্তিশালী গ্র্যাভিটেশন পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করতে থাকবে কৃষিক্ষেত্রের নিচের দিকে। দিন রাত কাজ চলতে লাগলো ডুডু টুটু-দের তত্ত্বাবধানে। আমি চলে এলাম সূর্যের সন্নিকটে। সূর্যের থেকে কিছু দূরে মহাশূন্যে একটি ঘাঁটি স্থাপন করলাম। কিছু দিন অপেক্ষা করে রইলাম সুযোগের প্রতীক্ষায়। পৃথিবীতে যেদিন আপনারা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে ব্যস্ত। পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন আপনারা মানমন্দির থেকে সূর্যকে পর্যবেক্ষণে রত, তখন আপনারা কি নূতন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন? বলুন প্রঃ বাটলার সেদিন একটা কিছু অভিনবত্ব কি লক্ষ্য করেছিলেন?"

—"হ্যাঁ, ডঃ কুণ্ডু করেছিলাম। সূর্যের উপরিভাগে একটি ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হ'তে দেখেছিলাম। সূর্যের থেকে বিরাট এক গ্যাসীয় পিণ্ডকে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখা গিয়েছিল।"

—"ঠিকই দেখেছেন প্রফেসর। যখন দেখলাম পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য এক সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। পৃথিবী এবং চন্দ্রের আকর্ষণ পুরোপুরিভাবে সূর্যকে আকর্ষণ করছে, সেই মুহূর্তে আমি চালু করে দিলাম আমার "মহাকর্ষণী" যন্ত্রটিকে। যার ফলে, পৃথিবী, চন্দ্র এবং আমার যন্ত্রের সহায়তায় সূর্য পৃষ্ঠে দেখা দিল এক প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা। নিক্ষিপ্ত হ'ল এক তাল গ্যাস-পিণ্ড। ছুটে আসতে লাগলো চাঁদের দিকে। এক মারাত্মক দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছি

সিদ্ধির পথে। যদি সফলকাম না হই তবে চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মহাশূন্য থেকে। কিন্তু আমাকে সফলতা লাভ করতেই হবে। মনে জোর এনে স্থির দৃষ্টি রাখলাম সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস-পিণ্ডের দিকে। চন্দ্রের আওতায় আসবার আগেই চালু করে দিলাম "কুইক এভোল্যুশন" মেশিন গ্যাস-পিণ্ডটিকে লক্ষ্য করে।

"আমাকে আশাতীতভাবে অবাক করে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকলো গ্যাসপিণ্ডের আকার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চোখের সামনে একে একে পট পরিবর্তন হতে লাগলো। গ্যাস হয়ে এলো ঠাণ্ডা, দেখা দিল কঠিন স্তর। দেখা দিল আবহমণ্ডল। জন্ম হ'ল একটি নূতন গ্রহের। "মহাকর্ষণী" যন্ত্রের সাহায্যে, গ্রহটিকে চ্যাপ্টা করে ফেললাম। গ্র্যাভিটেশন-এর জন্য স্থাপন করলাম "গ্র্যাভিটেশন পাওয়ার প্ল্যান্ট।" এক মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তৈরী হয়ে গেল কৃষিক্ষেত্র। যে সব বীজ পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করে এনেছিলাম পৃথিবী ত্যাগ করার প্রাক্কালে, তাই দিয়ে শুরু করলাম চাষ। সব কিছুই অবশ্য যান্ত্রিক উপায়ে করতে হয়েছে। জলের জন্য বসালাম "অটোমেটিক শাওয়ার প্ল্যান্ট।" আপনারা বোধহয় দেখে থাকবেন আমার কৃষিক্ষেত্রের মাঝে মাঝে "শাওয়ার প্ল্যান্ট" বসানো আছে।"

—"কিন্তু, পৃথিবীতে কি ভাবে এসব জিনিষ পাঠাচ্ছেন ডঃ কুণ্ডু? তাতে মাঝপথেই তো সব কিছু নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাই নয় কি?"—প্রশ্ন তোলেন ডঃ পাল।

—"তাই যদি হবে তবে পৃথিবীর মানুষকে তো কিছুই দিতে পারতাম না ডঃ পাল। আমার কয়েকটি বিরাট বিরাট আকাশ-যান হচ্ছে এ সবের বাহন। কৃষিক্ষেত্র থেকে ফসল কাটবার পর জমা হবে চাঁদে মানে, আমার এই মূল ঘাঁটিতে। তারপর আকাশ-যানে করে নিয়ে যাওয়া হবে পৃথিবীতে। দূর থেকে প্রথমটা আকাশ-যান-গুলি অপেক্ষা করে। তারপর তারা আশ্রয় নেয় বিরাট বিরাট মেঘের

আড়ালে। যখনই মেঘগুলি নির্দিষ্ট স্থানের উপর আসে তখনই আকাশ যান থেকে ঝরিয়ে দেওয়া হয় শস্যগুলিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-যান ফিরে আসে চাঁদের ঘাঁটিতে। প্রশ্ন থাকতে পারে, তরমুজ, আম ইত্যাদি ফল পড়বামাত্রই তো ফেটে একাকার হয়ে যাবে। সেগুলি আস্ত থাকবে কি উপায়ে? ফলের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে অন্য শ্রেণীর আকাশ-যান, যার ভেতর "মহাকর্ষণী" যন্ত্রটি থাকে বসানো। রেগুলেটারের মাধ্যমে যন্ত্রটি রেগুলেট করা হয়। ফলগুলি আকাশ-যান থেকে ছাড়বার পর, যন্ত্রটি তাদের প্রথমটা জোরে এবং মাটি থেকে কয়েক ফুট্ আগে একদম আস্তে করে নামিয়ে দেয়। সুতরাং নষ্ট হবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।"

প্রঃ বাটলার কিছু বলবার জন্য উস্‌খুস্ করতে থাকেন—

ডঃ কুণ্ডু বাধা দিয়ে বলে চলেন—"ধৈর্য্য ধরুন প্রঃ বাটলার, সবই ব'লবো আপনাদের সামনে। মহাশূন্যে যাতায়াতের যে রাস্তা সৃষ্টি করেছি, তাও একমাত্র সম্ভব হয়েছে "কুইক এভোল্যুশন" যন্ত্রের সাহায্যেই। আমার আকাশ-যানে যে যন্ত্রটি আছে তার মাধ্যমে একশত মিটার অবধি রাস্তা তৈরী করা সম্ভব, মহাশূন্যের মাঝখানে। যখন আমার যানটি আপনাদের রকেট যানের সান্নিধ্যে আসে তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই সেই রাস্তার সৃষ্টি করেছিলাম। যন্ত্রটি চালু করা মাত্রই একটি সোজা রশ্মি ছুটে চলে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে। এবং মুহূর্ত মধ্যে রশ্মিটিকে ঘিরে ধরে মহাশূন্যে অবস্থিত অন্যান্য পদার্থের কণিকাসমষ্টি। ক্রমাগত তারা ঐ রশ্মিটিকে কেন্দ্র করে তার চার-দিকে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যন্ত্রটির সাহায্যে ঐ ঘনীভূত অংশের উপর এবং নীচে একটি চাপের সৃষ্টি করা হলে, বেশ সুন্দর একটি মহাশূন্যের পথ তৈরী হয়ে যায়। চলবার সময়ে বেশ নরম নরম লাগে। মনে হয় নরম ফেনার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। কিন্তু এতে একটু বিপদের সম্ভাবনাও আছে, যদি কেউ হঠাৎ পড়ে যায় মানে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং ঘনীভূত অংশের উপরিভাগের

চাপ থেকে সরে যায়, তবে হয়তো তাকে মহাশূন্যের করালগ্রাসে পড়তে হবে। তার নিয়তি নির্ভর করবে নিকটবর্তী গ্রহের অদৃশ্য আকর্ষণের উপরে।

ধন্য, ধন্য করে উঠলেন সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী। ডঃ পাল বিনয়ের সঙ্গে বললেন—"আমরা অভিভূত হয়ে গেছি ডঃ কুণ্ড। আপনার অতুলনীয় আবিষ্কার, পৃথিবীর মানব সমাজ যতদিন তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবে, ততদিন শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করবে। আসুন ডঃ কুণ্ড এবার আমাদের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করুন।"

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরতা অবলম্বন করে ডঃ কুণ্ড বললেন—"তা হয় না ডঃ পাল। তা হয় না। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেছে আমাকে সন্ধান করতে হবে একটি নূতন পৃথিবীর। অথবা জন্ম দিতে হবে পৃথিবীর মত এক বিরাট গ্রহের। জানি না, আমাদের এই সৌরজগতে তেমন কোন জায়গা আছে কি না। যদি না থাকে তবে ছুটতে হবে আরো দূরে অন্য সৌর জগতে। সেখানে অন্তত মনুষ্যোপযোগী একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। তা না হলে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষের পুনর্বাসন অসম্ভব। আমাকে আপনারা মাফ্ করুন। পৃথিবীতে ফেরা আমার পক্ষে এখন সম্ভবপর হবে না। পৃথিবী আমার জন্মভূমি। পৃথিবীকে আমি ভালবাসি। পৃথিবীর মানুষও তাই আমার ভালবাসার পাত্র। খাদ্য এবং বাসস্থানের অভাব যদি মেটাতে পারি। তবে তাদের অন্তর থেকে কু-বৃত্তিগুলোও ধীরে ধীরে দূর করা সম্ভব হয়ে উঠবে। বিদায় বন্ধুগণ, বিদায়।"

সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে এক লাফে ডঃ কুণ্ড বেরিয়ে এলেন শয্যাগার থেকে এবং মুহূর্তের মধ্যে সন্নিকটে অবস্থিত আকাশ-যানে চেপে উধাও হয়ে গেলেন মহাশূন্যের মাঝখানে।

বিস্ময়বিমূঢ় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন মহাকাশের দিকে।

সে বিয়ে তো অলৌকিক নয়

ছবি এঁকেছেন : রেণু প্রধান

বাসুদেব ভট্টাচার্য

আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে কিছুটা এগিয়ে গঙ্গার ধারে বসেছিল অনিমেষ। শীতের সন্ধ্যার উত্তরে হাওয়াতেও জ্বালা জুড়োচ্ছিল না। আকাশ ছাওয়া ধোঁয়াশার আস্তরণ ক্রমশঃ তার রিক্ত নিঃস্ব মনের প্রতিটি শূন্যস্থান গ্রাস করে চলছিল। সিগারেটের

খালি প্যাকেটটা একবার হাতড়ে বিমনা হয়েই জলে ছুঁড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ভাঁটার টানে ভাস্‌তে ভাস্‌তে দূরে চলে যাওয়া প্যাকেটটির দিকে। অনিশ্চয়তার সমুদ্রে অবিরাম সাঁতার দিয়েও কোনো কূল পাচ্ছিল না সে। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেও ভাবা সম্ভব ছিল না যে জীবন-উপন্যাসের একটা সুন্দর করে গ'ড়ে তোলা অধ্যায় ঝোড়ো হাওয়ার বেগে এমন করে পর পর পাতা উল্টে অকস্মাৎ নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে। আরতির মুখে এতোকাল শুনে শুনে মানুষটার হৃদয়বত্তার যে পরিচিতি মনে শ্রদ্ধার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল, আর্কিটেক্‌চারাল্ ইঞ্জিনীয়ার ডঃ সরকারের অপমানসূচক উক্তিতে মুছে গিয়েছিল সে ছবি। আর আরতি? এতো শান্ত, ধীর, আত্মসমাহিত মেয়েটি কখনো বিদ্রোহ করতে শেখেনি যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাবার মুখের ওপরে তার মনের নিভৃতে সযত্নে লালিত ইচ্ছাটা জানাতে পারতো। অনিমেষও জেনেছিল, মনের মধ্যে সৃষ্ট এই ক্ষত কোনোদিন পথ পাবে না বাইরে প্রকাশ পাবার। তিলে তিলে শেষ হবে আরতি, তবু ক্ষীণ প্রতিবাদটুকুও জানাবে না। আর ডঃ সরকারে আভিজাত্যবোধ যে এত গভীর, অপরকে তাচ্ছিল্য করার মত এতো নির্মম, তা কখনো ভাবতে পারেনি অনিমেষ।

—"আরে, আমাদের অনিমেষ না?" খুব চম্‌কে গেল অনিমেষ। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো কল্যাণকে। তার ক্যাল্‌কাটা মেডিক্যাল্ কলেজের একদা সহপাঠি এবং অকৃত্রিম সুহৃৎ কল্যাণ মিত্র।

—"কিরে আজ যে বড় একা? কপোতীটি গেলেন কোথায়?" কল্যাণ পরিহাসতরল কণ্ঠে শুধোলো। "তারপর? 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'র শুভদিনটি কবে?"

"দিন ঠিক হয়ে গেছে তো।" জবাব দিলো অনিমেষ। "আগামী ৭ই মাঘ। হবু স্বামীটি ক্যালিফোর্ণিয়ার ডক্টরেট ও খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ এঞ্জিনীয়ার কুমারেশ রায়।"

—"য়্যাঁ!" যেন চম্‌কে উঠ্‌লো কল্যাণ।—"আসল শিবই যজ্ঞ

থেকে বাদ? তারমনে এতদিন ধরে তাহলে তোর সঙ্গে শুধুই খেলা করে কাটালো কপোতী?"

—"না, তা নয়। বিয়েটা আরতির ইচ্ছেয় হচ্ছে না। ডঃ সরকার বহু যোগাযোগ করে স্বয়ং এ সম্বন্ধ পাকা করেছেন। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার সাহস নেই আরতির।..."

সমস্ত ঘটনা খুলে জানালো অনিমেষ। পাশে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো কল্যাণ। মনে মনে দুঃখ বোধ করলো অনিমেষের জন্যে।

—"জানিস্ অনু, আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগে যে আমরা এতো উন্নত সভ্য হয়েছি সুরুচিসম্পন্ন হয়েছি, তবু জোর করে আপন ইচ্ছার পাষাণটা চাপিয়ে দুটি প্রণয়োন্মুখ অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দেবার আদিম প্রবৃত্তিটা আজও সংবরণ করতে পারিনি। ডঃ সরকার হয়তো বড়জোর দশ বারো বছর বাঁচবেন আর, কিন্তু তাঁর ভুলের মাশুল শোধ করতে হবে দু'টি অমূল্য জীবনকে সুদীর্ঘকাল ধরে! অদ্ভুত মানুষের ন্যায় অন্যায় বিচার বুদ্ধিহারা আভিজাত্যের গর্ব...কিন্তু যাক্ সেকথা। এখন কি করবি কিছু ভেবেছিস্?"

—"করার মত এখনো যে কিছু আছে তা তোর মনে হয়?"—ম্লান হাসলো অনিমেষ।

—"হতাশ হলে চলবে না তোর। করার মত একটা কিছু খুঁজে বের করতেই হবে। অন্যায়ের কাছে এভাবে আত্মবলি দেওয়া উচিত নয়।"

—"কিন্তু কী করতে পারি বল্?"

"—যার ওপরে তোর সব চাইতে বড়ো অধিকার, তাকে অন্যায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবি না?" কল্যাণ শুধোলো।

—"আমি দাবী নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আরতির পক্ষে রাজী হওয়া কোনমতেই সম্ভব হয় নি। ও জানিয়েছে তোমায় গ্রহণ করেছি সূর্যের আলোর মত প্রকাশ্যে সহজভাবে। জীবনে যা জোর করে পেতে হয় তাতে মত নেই আমার। কারণ তাতে একটা লাভ

আসে আরেকটা ক্ষতির পথ ধরে, সে লাভের মধ্যে পাবার পরিপূর্ণতা থাকে না কিছুতেই।"

..."অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! আমি আবার তোদের এসব প্রেম-ট্রেমের কিছু বুঝি না।" বল্‌লো কল্যাণ। "কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তোরা দু'জনেই পরস্পরকে জীবনে আপন করে পেতে চাস তাই না? সে চাওয়ার মধ্যে কারো কোনো ফাঁকি নেই তো? সেন্টিমেণ্টাল হস্‌নে অনু, ভাল করে ভেবে জবাব দে।"

ম্লান হেসে নিরুত্তর রইলো অনিমেষ। এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে সে? এতোদিন ধরে মেলা-মেশায় আরতির মন বুঝে নেবার পর আজ আর এ সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

"ঠিক আছে!" কল্যাণ বললো।..."শোন তোদের দু'জনের এ বিয়ে হবেই এবং তার দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে। তবে একটা শর্ত আছে। আমি যা যা বল্‌বো বিনা দ্বিধায় তা পালন করতে হবে এবং আমার কোন কাজে আশ্চর্যান্বিত বা অবাক হলেও তা প্রকাশ করবি না। ভেবে দেখ্।"

"কি ব্যাপার বল্‌তো? তুই কি আজকাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের রিসার্চ্ ছেড়ে ম্যাজিক শিখছিস? নাকি সম্প্রতি ক্যানারিস্ স্যাটিভার (গাঁজা) ব্যবসা সুরু করেছিস?" এতো দুঃখেও হাসি পেলো অনিমেষের। "অবশ্য বিজ্ঞানের উদ্ভট গবেষণার দিকে চিরকালই তোর ঝোঁক তা জানি, তবে সেটা যে আজকাল ঘটকালির কাজে নিয়োগ করছিস তা জানা ছিল না!"

"বিজ্ঞানের অনেক কিছুই তোর এখনো জানা বাকী আছে, অনিমেষ! এবং তা দেখিয়েই তোকে আমার গবেষণালব্ধ ফলের প্রমাণ দেবো। এখন যা বলি শোন্। কাল বিকেল পাঁচটায় মিউ-জিয়ামের মেন্ গেটের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করবি। আমার ল্যাবরেটরী যা দেখার সৌভাগ্য খুব অল্প কয়েকজনের বরাতেই জুটেছে ...সেই ল্যাবেরেটরীতে তোকে নিয়ে যাবো। না, না, সন্দেহ নয়, আমি

কথা দিচ্ছি, তোদের এ বিয়ে হবে, ৭ই মাঘই হবে এবং তা ডঃ সরকারের বাড়ীতে তাঁর উপস্থিতিতেই হবে। এখন চল, আর ঠাণ্ডা লাগাতে হবে না গঙ্গার ঘাটে বসে।"

পরদিন সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ষ্টেশনের কাছে রেল লাইন পেরিয়ে অনেক গলিপথ ঘুরে ছোট্ট অস্টিনটার তীব্র হেড্‌লাইটে পথ উদ্ভাসিত করে একটা ভাঙাচোরা পুরোণো তিনতলা বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালো কল্যাণ আর অনিমেষ। দেয়ালের যেটুকু জায়গায় আলো পড়েছিল, পলেস্তারা খসা, ইঁট বেরিয়ে পড়া সেই জায়গাটার দিকে তাকালো অনিমেষ। বহু অতীতের সাক্ষীর সর্বাঙ্গে বহুকালের অযত্ন আর অব্যবহারের চিহ্ন। কল্যাণ গাড়ীর দরজা বন্ধ করে এগিয়ে যেতেই বিরাট পাল্লাওয়ালা একটা দরজা খুলে গেল এবং ভেতরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো ওরা কল্যাণের টর্চের আলোয় পথ দেখে। একটা দরজার সামনে এসে টর্চ নিবিয়ে দরজা খুললো কল্যাণ। পরক্ষণেই টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো বিরাট ল্যাবরেটরী।

চতুষ্কোণ ঘর। কোথাও কোনো জানলা নেই। যে দরজাটা দিয়ে ওরা ঢুকলো সেটা পুরু ইস্পাতের চাদরে তৈরী এবং সর্বত্র অসংখ্য রিভেট্ লাগানো। ঘরের উত্তরে দেয়াল বরাবর টানা লম্বা ওয়ার্কিং-টেবল্। তার ওপরে একটা দামী মাইক্রোস্কোপ আর সুগন্ধি চীর উডের স্লাইড ক্যাবিনেট্। দক্ষিণের দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা অটোক্লেভ্, ব্যাক্‌টিরিওলজিক্যাল ইনক্যুবেটর ও থার্মোষ্ট্যাট। পূব দিকে দেয়াল থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখা একটা বড়ো টেবিলে সাজানো নানাবিধ গ্লাস অ্যাপারেটাস্। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্লাইইড্ দিয়ে ঘেরা ফিউমিং চেম্বার। পশ্চিমের দেয়ালের কাছে টেবিলে সাজানো ফোটো ইলেকট্রিক কালারিমিটার। আরও নানান কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রপাতি—যার একটিও অনিমষের জানা নেই। পাশের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে কল্যাণের অপারেশন থিয়েটার। ঘরের

মাঝখানে অপারেশন-টেবল, দেয়ালের ধারে ধারে সাজানো কাঁচের আলমারীতে শিশি ভর্তি প্লাষ্টার অব প্যারিস-এর মত শাদা পাউডার এবং অন্যান্য কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট। এই ঘরে একটা ষ্টিরিও-মাইক্রোস্কপ আছে, আছে নরদেহের সামগ্রিক ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপজোক নেবার যন্ত্রপাতি, অ্যান্থ্রোপোমিটার ইত্যাদি। একধারে একটা ক্যামেরা, ফোটো এন্‌লার্জার এবং প্রোজেক্টারও আছে দেখা গেল।

—"পিতৃপুরুষের বিপুল সম্পত্তির চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছিস দেখছি!" বললো অনিমেষ।

—"তুই ঠাট্টা করছিস? কিন্তু সত্যিই এর চাইতে অর্থের আর বড়ো সদ্ব্যবহার হতে পারে বলে আমার জানা নেই। আজ আমরা যে আবিষ্কারের নেশায় ছুটে চলেছি, একদিন সারা বিশ্ব জানবে সে কথা।"

—"দেখিস্ শেষে যেন পর্বত আবার মূষিক প্রসব না করে!" —অনিমেষের কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

—"ধৈর্য আর বিশ্বাস রাখো, বন্ধু! বিজ্ঞান যে কী করতে সক্ষম তার কতোটুকু তোরা জেনেছিস্? তার কিছু প্রমাণ আমার কাজের মধ্যে পাবি। কিন্তু আমার শর্তের কথা মনে আছে তো? পুরো নির্ভর করতে হবে আমার ওপর, নির্দেশ ছাড়া একটা কথাও বলার চেষ্টা করবি না। হ্যাঁ ভাল কথা! ক্যালিফোর্ণিয়ান জার্ণাল অফ্ এঞ্জিনীয়ারিং সায়েন্সের গত ডিসেম্বরের কপিটা এনেছিস?"

—হ্যাঁ, এই যে! পাতা উল্টে ডঃ কুমারেশ রায়ের আবক্ষ ফটোখানি মেলে ধরলো অনিমেষ।

—"ঠিক আছে! ওটা টেবিলে রাখ। এখন এক কাজ কর। এই লম্বা টেবিলটার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়, আমায় কতকগুলো মেজারমেণ্ট নিতে হবে।" অনিমেষের চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি থেকে সুরু করে সারা দেহের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ নিয়ে রেকর্ড করলো কল্যাণ।

—"কিন্তু কী তোর প্ল্যান, জানাবি না আমায়?" শুয়ে শুয়েই বল্‌লো অনিমেষ।

"—না। সেটা জানানো এখন সম্ভব নয়। কেন, তুই কি বিশ্বাস করতে পারছিস না আমাকে?" কথা বলতে বলতে ডঃ কুমারেশ রায়ের ছবিটার একটা নেগেটিভ্‌ বানালো কল্যাণ। তারপর এন্‌লার্জারে চাপিয়ে অনেক কিছু মাপজোক করে রেকর্ড করলো।

—"চল্‌ তোকে একটা লিফ্‌ট দিয়ে আসি।" ওরা দুজনে বেরুলো। "তারপর? আমার আণ্ডারগ্রাউণ্ড্‌ ল্যাবরেটরী কেমন দেখলি?"

—"ভালো। তবে তোর কর্মপন্থা বুঝলাম না কিছুই।" বললো অনিমেষ।

—"এখন বুঝবি না। তবে জেনে রাখ্‌, এটাই আমার ল্যাবরেটরীর সবটা নয়। মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বল্‌তে পারিস।"

—"বাকী চারভাগ তাহলে কোথায়?"

—সেটা টপ্‌ সিক্রেট! এবং আমি না জানালে পৃথিবীতে এখন কোনো শক্তি নেই যা সেটার অবস্থান খুঁজে বের করতে পারে। তবে জেনে রাখ্‌, যদি আমার অসাবধান মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে কেউ জেনে ফেলে তবে তক্ষুনি মৃত্যু ঘটবে আমার।"

কল্যাণের কথাবার্তায় অনিমেষের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে ও একটা আস্ত পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়!

* * * * * * *

৭ই মাঘের সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ হলো বরসাজে সজ্জিত অনিমেষকে নিয়ে ফুলে সাজানো ক্যাডিল্যাক্‌ ড্রাইভ্‌ করে বেরিয়ে গেছে কল্যাণ। তার দুই অনুরক্ত রিসার্চ স্কলার লিলি আর অনিতা এসে সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে গেছে অনিমেষকে। কল্যাণের নির্দেশমত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাউকেই নিমন্ত্রণ করতে পারেনি অনিমেষ। সে

চেয়েছিল যেন লিলি আর অনিতা অন্ততঃ বরযাত্রিনী হয়, কিন্তু কল্যাণ তাতেও রাজী হয়নি। ওদের নাকি ঐ সময়ে একটা বিরাট কাজের দায়িত্ব যুগ্মভাবে নেওয়া আছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছে অনিমেষ!

ওদের গাড়ী এসে পড়লো। ডঃ সরকারের বাড়ী আজ অপরূপ মনোহরণ সাজে সেজেছে। মোরাম বিছানো পথের দুপাশে ফোয়ারা থেকে অবিরাম উছলে উঠছে জলের ধারা আর নানান্ রঙের আলোর খেলায় মেতে উঠছে। কম্পাউণ্ডের সমস্ত সারিবদ্ধ ক্যাসুয়ারিনার শাখায় শাখায় আলোর মালা। একপাশে বিরাট লনে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের গাড়ী।

অর্ধচন্দ্রাকার গাড়ী-বারান্দার নীচে গাড়ী থামালো কল্যাণ। সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি, আতর ও ফুলের বৃষ্টি হতে লাগলো। মিসেস সরকারসহ এগিয়ে এলেন ডঃ সরকার···"এসো বাবা কুমারেশ।" অনিমেষ চম্‌কে উঠ্‌লো। প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছে, এমন সময় কল্যাণ ইসারায় চুপ করে থাকতে বললো। কল্যাণের জ্বলন্ত চোখে গভীর ভৎর্সনা! ও চুপ করে গেল। একটা বিরাট সুসজ্জিত হল্‌ঘরে তৈরী করা ছিল সিংহাসন। অনিমেষকে অভ্যর্থনা করে আদর করে বসালেন মিসেস্ সরকার। ডঃ সরকার কক্ষে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হবু জামাতাকে।···"ইনিই হলেন ডঃ কুমারেশ রায়, সেই বিশ্ববিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার···যাঁর ছবি আপনারা সকলেই দেখেছেন বিভিন্ন জার্নালে। এমন সুচিন্তিত অভিমত ও তথ্যপূর্ণ থিসিস্ গত দশবছরে কেউ এঞ্জিনীয়ারিং সায়েন্সে সাব্‌মিট্ করেছেন বলে জানা যায় নি। আজ এই ব্রাইট ইয়ংম্যানকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধতে পেরে আমি, আমার স্ত্রী, আমরা সকলেই খুব আনন্দিত।"

ডঃ সরকারের উক্তিটি সকলেই আনন্দিতচিত্তে অনুমোদন করলেন। এগিয়ে এলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রঞ্জন ভৌমিক···"তোমার

সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাই কুমারেশ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তোমার ছবি দেখেছি প্রচুর। কিন্তু কায়াময় যুবকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পূর্বে কখনো হয়নি। আজ খুব খুশী হলাম রায়।"

কী হলো আজ অনিমেষের? তা'র মাথার ঠিক আছে তো? না কি সভাস্থ সকলকেই হিপ্‌নোটাইজ করেছে কল্যাণ! তাকে দেখার পরও ডঃ সরকারের ধারণা আরতির বিয়ে হচ্ছে কুমারেশ রায়ের সঙ্গে! তার চেহারার সঙ্গে তো কুমারেশ রায়ের কোনো মিল নেই! তবে যাঁরা ছবি দেখেছেন, চাক্ষুস দেখেছেন কুমারেশ রায়কে, তাঁদের এ ভুল, এ মারাত্মক ভ্রান্তি সম্ভব হচ্ছে কি করে? অনিমেষ কি চীৎকার করে বিদ্রোহ জানাবে···, ডঃ সরকারের এ ভুলের কথা সকলকে জানিয়ে দেবে? এ অসম্ভব! কুমারেশ রায় সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসা মানেই প্রতারণা, যা কোনো আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন যুবকের পক্ষেই অপমানজনক! কিন্তু বিয়ের লগ্ন তো আর মাত্র পনেরো মিনিট পরেই, তবে আসল কুমারেশ রায়ের এসে পৌঁছবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কেন।·····আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগ্‌লো অনিমেষ। তারপর কথা বল্‌তে গিয়েই বুঝলো গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না তার। নিদারুণ অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে উঠ্‌লো ওর মন। কল্যাণ লক্ষ্য করলো সেটা। সে এতক্ষণ ওর পাশেই বসেছিল।

—"কি কুমারেশ, কিছু বল্‌বে?"

···"হ্যাঁ, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মাথার মধ্যে টিপ্‌-টিপ্‌ করছে যেন। আপনারা যদি অনুমতি করেন ডঃ মিত্রের সঙ্গে একটু বাইরে যেতে চাই।" কথাগুলো বলেই হঠাৎ চম্‌কে উঠলো অনিমেষ! এ কী গম্ভীর কণ্ঠস্বর! তার স্বরের অদ্ভুত পরিবর্তন!

—"কি হলো রায়?" ডঃ সরকারের স্নেহভরা কণ্ঠে উদ্বেগ। "ডাক্তার ঘোষকে বল্‌বো?"

—"না, না, ব্যস্ত হবেন না।" বললো কল্যাণ। "ও একটু

পায়চারী করে এলেই ঠিক হয়ে যাবে। সারাদিন শরীরের ওপর ষ্ট্রেন্ গেছে তো!"

—"ঠিক কথা। আচ্ছা তোমরা কম্পাউণ্ডের বাগানে ঘুরে এসো একটু।" বললেন ডঃ সরকার।

প্রাঙ্গণের পূব-প্রান্তে ক্যাক্টাস্ গার্ডেনের সামনে একটা চত্বরে এসে বস্লো ওরা। "প্রতারণা আমি কিছুতেই করতে পারবো না কল্যাণ। এ তুই কি অবস্থার সৃষ্টি করেছিস্ বুঝতে পারছিস না।" অনিমেষ অধীর।

—"সব কিছু ভেবেই করছি আমি। তোমার কোন কথা শোনবার এখন সময় নয়।" কঠিন আদেশের সুর কল্যাণের কণ্ঠে। —"শর্তের কথা মনে রেখো। না হলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে। আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না। আর তুমি এখন সম্পূর্ণ আমার অধীন। আমার ইচ্ছে ব্যতিরেকে একটা কথা পর্যন্ত উচ্চারণের ক্ষমতা নেই তোমার।" আরো কাছে এসে অনিমেষের পিঠে হাত রাখলো কল্যাণ।···"আমার কোনো অসৎ অভিপ্রায় নেই বন্ধু। তুই একটু Steady হ। তোর, কপোতীর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে। এখন কোনো বাধার সৃষ্টি করিস্ নে। ঐ ওঁরা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। মনে রাখিস্, এখন তুই কুমারেশ রায়, অনিমেষ মজুমদার নয়।"

—"কিন্তু ··কিন্তু ·····" কথা মাঝপথে থেমে গেল। শত চেষ্টা করেও একটা বর্ণ উচ্চারণ করতে পারলো না অনিমেষ। কল্যাণ হাস্তে লাগলো···"তুই কিছুতেই বল্তে পারবি না সে কথা যা আমি শুন্তে চাই না।"

খুবই বিপন্ন বোধ করলো অনিমেষ। ক্ষীণতম প্রতিবাদও করতে পারলো না। যন্ত্রচালিতবৎ চলে গেল বিয়ের আসরে।

—"হ্যাল্লো রয়! হা-ডু-ডু!" এগিয়ে এসে করমর্দন করলো কুমারেশ রায়ের বন্ধুরা।

—"আমরা ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি আশা করি!" বললো একজন। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললো—"লিজা, সুসান, এমিলি, নিনা আর ইভা গ্র্যাণ্ড থেকে এলো না কিছুতেই। তুমি যে এতো আশা দিয়ে শেষে একটা নিগার মেয়েকে বিয়ে করবে, এটা ওদের কাছে অপ্রত্যাশিত রয়। হাঃ হাঃ হাঃ! নিতান্তই ভাগ্যহীনা বেচারীরা!" বাধ্য হয়ে হাসিতে যোগ দিতে হলো অনিমেষকে। ব্রাইট ইয়ংম্যানের ব্রাইট ক্যারাক্টার!! মুখ ক্রুর হাসি ফুটলো অনিমেষের।

যথারীতি বিবাহ পর্ব শেষ হলো। ভোরের আলো লাগা পাণ্ডুর চাঁদের মত মুখ অশ্রুর ধারায় ভাসিয়ে মালাবদল করলো আরতি। অভ্যাগতেরা সব শেষে বিদায় নিলেন একে একে। বরবধূ বাসরে চলে গেল। সারারাত ওরা দুজনে কেউই একটা কথা বলতে পারলো না, এমনি ওদের মানসিক অবস্থা তখন!

সকালের নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান শেষে বিদায় নিলো বরবধূ। সঙ্গে আগমনে কিছু আত্মীয়স্বজনদের ডঃ কুমারেশ রায়ের ১৭ নং সুইন্‌হো এভিনিউস্থিত ম্যান্‌সনে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে কল্যাণ সোজা বরবধূকে নিয়ে চলে এলো তার ল্যাবরেটরীতে। আরতি আসবার পথেই প্রথম চিনতে পারলো কল্যাণকে। এতক্ষণ তার মানসিক অবস্থার জন্যেই মুখ তুলে তাকায় নি।

—"তুমি ঐখানে চেয়ারটাতে বসো কপোতী। এবারে আমি কিছু ম্যাজিক দেখাবো। কিন্তু কথা দিতে হবে, যদি ম্যাজিকের শেষে বিরাট একটা প্রাপ্তিযোগ ঘটে তাহলে এই অধমকে কিছু বখ্‌শিশ্‌ দিতে হবে! লিলি, নতুন বরকে একটা আয়না এনে দাও তো!"

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল অনিমেষ। প্রতিবিম্ব অবিকল কুমারেশ রায়ের! ঠিক সেই রকম মুখ, তীক্ষ্ণ নাসা, ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখ আর প্রশস্ত কপাল! এইজন্যেই সাজাবার সময়ে অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে আয়নায় মুখ দেখতে দেওয়া হয়নি! এই

জন্যেই বিয়ে বাড়ীতে কারো মনে সামান্যতম সন্দেহ হয় নি তাকে দেখে! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব হলো? তবে কি কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কারের সন্ধান পেয়েছে কল্যাণ? অনেক ভেবেও কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না অনিমেষ।

ততক্ষণে কল্যাণ বিরাট কফিনের মত কাঁচের স্বচ্ছ একটা যন্ত্র এনে ল্যাবরেটরীর মেঝেতে রেখেছে। যন্ত্রটির তলায় অনেকগুলি অ্যাল্-কাথেন টিউবের মত সারি সারি টিউব লাগানো। সেই টিউবগুলির বেরিয়ে থাকা প্রান্তভাগ নিয়ে কল্যাণ নানান্ আকারের অদ্ভুত আকৃতির যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে লাগলো। যন্ত্রগুলি আগেই অনিমেষ দেখেছে, তবে কোনটাই বুঝতে পারে নি। নলগুলি সব যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার পরই কল্যাণ যান্ত্রিক কৌশলে কফিনের ঢাক্না খুলে ফেললো। তারপর একটা অ্যাস্পিরেটার বট্ল্ থেকে গাঢ় সিরাপের মত বেগুনী রঙের তরল মেজার গ্লাসে ঢেলে অনিমেষকে খেয়ে নিতে বললো। খুব মিষ্টি আর অত্যন্ত ঝাঁঝালো লাগলো অনিমেষের।

পাঁচ মিনিট ধরে কার্ডিওগ্রাফ নিলো কল্যাণ। তারপর পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো শাদা রঙের মনুষ্যদেহের পূর্ণাবয়ব ছাঁচের বুকের ও পিঠের দিকের দুটো লম্বা খণ্ড। সম্ভবতঃ প্লাষ্টার অফ্ প্যারিসের তৈরী হবে। তারপর ছাঁচের পিঠের দিকের অংশটা রাখলো কফিনের মধ্যে এবং অনিমেষকে চিৎ করে শুইয়ে দিলো তার ওপরে। ছাঁচের বাকী অংশটা ওর বুকের দিকে এমন ভাবে সেট্ করলো যে অনিমেষের সমস্ত দেহটা ঢাকা পড়ে গেল ছাঁচের ভিতর। তারপর দুটো অংশের মাঝখানের জোড়ের জায়গায় শাদা রঙের কি একটা আঠার মত জিনিষ লাগিয়ে সীল করে দিলো কল্যাণ। প্রায় তিন চার মিনিট পরে কফিনের মধ্যেকার কয়েকটি ষ্টপ্কক্ ঘুরিয়ে দিতেই ঘন শাদা ধোঁয়ায় ভরে উঠলে কফিনটি এবং সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক উপায়ে ঢাকনাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

আরতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কফিনের দিকে। ওর মনের অবস্থা বুঝে কল্যাণ ওকে অভয় দিলো। প্রায় পনেরো মিনিট পরে শাদা ধোঁয়া মিলিয়ে গেল এবং চোখ জুড়োনো সবুজ আলোয় ভরে উঠলো কফিনটি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই কল্যাণ দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা যন্ত্রের হাতল ঘোরাতে লাগলো। এবং ধীরে ধীরে অপসারিত হলো সবুজ আলো। শাদা রঙের ছাঁচটিকে পূর্ববৎ দেখা গেল। কল্যাণ দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ অন্ করতেই পার্শ্বস্থিত ডায়ালে মিটারের কাঁটার মত একটা কাঁটা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগালো। একটু পরেই ধীরে ধীরে খুলে গেল কফিনের ঢাকনা এবং সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল ছাঁচের বুকের দিকের দিকের খণ্ডটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অনিমেষকে, তার নিজস্ব চেহারায়। গভীর অচেতন। তার বাহু-মূলে একটা ইনজেক্শন করলো কল্যাণ। তারপর ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্ট বিট্ পরীক্ষা করতে লাগলো। কয়েক মিনিট পরেই চোখ মেলে তাকালো অনিমেষ। কুমারেশের জায়গায় অনিমেষকে দেখে আরতি তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। যেন সে স্বপ্ন দেখলো এতক্ষণ।

—"আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো কপোতী! তারপর তোমার স্বামীকে তোমার হাতে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো।" কল্যাণ জানালো আরতিকে।

"আমার বুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে কল্যাণদা!" মনের মধ্যে একটা বিষম অস্বস্তিতে ছট্ফট্ করে উঠলো আরতি।

"বুদ্ধি গুলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। একটু স্থির হও, সব বলছি একে একে।" একটা বিরাট ট্রেতে নীলাভ পাউডারের ওপর অনিমেষকে শোয়াতে শোয়াতে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো কল্যাণ। আরতি সব শেষে লজ্জায় মাথা নীচু করে করলো। তার জীবনের অসম্পূর্ণতা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পরিপূর্ণতায় ভরে উঠবে, তা ভাবতেও পারেনি সে।

"কিন্তু বাবা যখন সব জানতে পারবেন?" তার দৃষ্টিতে তখনো শঙ্কা।

"কোনো উপায় নেই কপোতী। এ 'শক্' তাঁকে সহ্য করতেই হবে; অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে। ক্রমশঃ যখন তিনি জানতে পারবেন যে যৌনব্যাধিগ্রস্ত, বহু প্রণয়িনী-পরিশোভিত একটা স্নব্··· যার কেবল আভিজাত্যের গর্ব ছাড়া আর কিছুই নেই, তারই হাতে একমাত্র সন্তানকে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন, তখন 'শক্'টা একটু কম্‌বে।"

"কুমারেশ রায় স্নব্! এতোবড় স্কলার..."

"স্কলার না ছাই!" আরতির কথা শেষ না হতেই বল্‌লো কল্যাণ।···"জেনে রাখো, যে থিসিস্ সাবমিট্ করে সে এতো সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে থিসিস্ একটি গরীব মেধাবী ছাত্রের থেকে চুরি করা! বড়োরা চুরি করলে তো কখনো ধরা পড়ে না। তাই কুমারেশ রায়ও টাকার জোরে তার আসল রূপ প্রকাশের সব রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছিল। যাক্ সে কথা! তোমাদের বিষয়ে আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি। ক'দিন তোমরা একটু গা ঢাকা দিয়ে এ গরীবের ভবন অধিকার করে থাকো। ইতিমধ্যে সত্যিকারের কুমারের রায়·· যাকে এখন বিজ্ঞানের হাতে ক্রীড়নক করে রাখা হয়েছে···সে ছাড়া পেয়ে চলে যাক্ ডঃ সরকারের কাছে। তারপরের ঘটনা আমি কল্পনা করে নিচ্ছি। কুমারেশের কথাবার্তায় ওকে উন্মাদ সাব্যস্ত করেছেন ডঃ সরকার এবং মেয়ের খোঁজে সারা পৃথিবী তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। ঠিক এমনি সময়ে তুমি আর অনিমেষ গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এসেছো এবং খ্যাতনামা এঞ্জিনীয়ার কুমারেশ রায়ের চরিত্রের সত্যিকার অন্ধকার দিকটা সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে এসেছো।"

"কিন্তু কুমারেশ রায় এখন কোথায়?"

"বেচারার জন্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছে আমার!" বললো কল্যাণ।

"কোথায় জাঁকজমক করে বরযাত্রী নিয়ে আসছিল বিয়ে করতে,··· ডঃ সরকারের বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে বহু রক্ষিতার ভরণ পোষণের সিকিউরিটির প্রতীক হতে'···তা হলো না! বিধি বাম! পথের বাঁকে কুমারেশরূপী অনিমেষের গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল কল্যাণ মিত্র, কুমারেশের মতই সাজানো গাড়ী নিয়ে। বেচারা কুমারেশ রায় বাঁকে টার্ণ নিতেই চালান হয়ে গেল সময়ের চতুর্থ মাত্রায় অর্থাৎ ফোর্থ ডাইমেনশনের আবর্তে। বাকী শোভাযাত্রা অনিমেষকে নিয়ে চলে গেল। সন্দেহের অবকাশ রইলো না কোথাও। এখনও গাড়ী নিয়ে ঘুরছে বেচারা কুমারেশ, কোনো রন্ধ্র খুঁজে পাচ্ছে না বেরিয়ে আসার। আমি না দেখালে সারা জীবনেও ও খুঁজে পাবে না পথ। হতভাগ্য বেচারা।···কল্পনা করছি, ওদের সুইন্‌হো ম্যানসনে এতক্ষণ হুলুস্থুল পড়ে গেছে। বরবধূ এখনো ফেরেনি। প্রতিটি হাসপাতালে আর পুলিশ-ষ্টেশনে খোঁজ করা সুরু হয়েছে। এইবার আমি ওকে ছেড়ে দেবার আয়োজন করি। লিলি, কুমারেশকে রিলিজ করে দাও।"···সহকারিণীকে আদেশ করলো কল্যাণ।

"কোথায় ছেড়ে দেবো ওকে?" লিলি শুধোলো।

"এক কাজ করো। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে যেখানে মোটর গিয়ে থামে, সেইখানেই ফুলে সাজানো গাড়ীশুদ্ধ কুমারেশকে নামিয়ে দাও।" সুপরিকল্পিত আদেশ কল্যাণের।

"ছি ছি, এ ভারী অন্যায় হবে। শুধু শুধু ভদ্রলোককে হয়-রানি করা ঠিক হবে না।"

"আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি কোরো না।" বজ্রকঠিন কণ্ঠ কল্যাণের।···"যে দুরভিসন্ধি মনে নিয়ে ও তোমাকে বিয়ে করতে আসছিল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কপোতী। তাই ওকে এই কষ্ট দেবার প্রয়োজন আছে। লিলি, তোমার কর্তব্য বিনা-দ্বিধায় করে যাও।"

"তাই হোক স্যার।" লিলি পাশের ঘরে চলে গেল। তত-

ক্ষণে অনিমেষের জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। বেশবাস সম্বৃত করে উঠে পড়েছে ও। এই অতি-নাটকীয় অথচ সত্য ঘটনা-পারম্পর্যের আদ্যোপান্ত ধীরে ধীরে মনে পড়ছে তার। যা ঘটলো এবং ভবিষ্যতে কল্যাণ যা করবে তার সব কিছু জেনেছে এখন অনিতার কাছে।

"কল্যাণ, তোর ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না। কিন্তু, কিন্তু তুই কি কোনো অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান? এসব কেমন করে করা সম্ভব হলো?"···অনিমেষের প্রশ্নে গভীর বিস্ময়।

"নেভার বন্ধু! জগতে অলৌকিক বলে কিছু নেই। যা ঘটে তা সবই বিজ্ঞানসম্মত। মানুষ যে ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না তাকেই অলৌকিক বলে ধরে নেয়। আর আজকের মানুষের সীমিত ক্ষমতার কাছে যা অসম্ভব, কাল আরো শক্তিশালী হয়ে মানুষ যে তাই-ই সম্ভব করে তুলেছে,··এ দৃষ্টান্ত তো বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সর্বত্রই দেখতে পাই।"

—"কিন্তু মানুষের আকৃতির ইচ্ছামত পরিবর্তন ঘটিয়ে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিস তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?"

—"খুব সোজা ব্যাখ্যা। আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকের দেহের নিজস্ব আকৃতির জন্য প্রধানতঃ অস্থিময় কাঠামোটাই দায়ী। এই অস্থিসমূহের কোষগুলির মাতৃগর্ভে থাকাকালীন নরম, প্ল্যাষ্টিক অবস্থাটা কল্পনা কর। কিংবা আরো আগের পর্যায়ে—যে অবস্থায়-দেহের কোনো গঠনই হয়নি, শুধু কোষ-বিভাজন হয়ে "ব্লাষ্টুলা" (মাতৃ গর্ভে ভ্রূণের এক অবস্থা যখন ভ্রূণ অনেকগুলি কোষে তৈরী একটা ফাঁপা বলের মত দেখতে) বা "গ্যাষ্ট্রুলা" (ভ্রূণের "ব্লাষ্টুলা" অবস্থার পরের অবস্থা, যখন ঐ কোষের তৈরী বলটি দু'টি স্তরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে) ইত্যাদির গঠন হচ্ছে এখন ধরা যাক এমন এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো যার দ্বারা পূর্ণাবয়ব দেহের প্রতিটি 'টিস্যু'কে, প্রতিটি সেল্‌কে ঐ অবস্থায়, এমন কি ব্লাষ্টুলার অবস্থায় আনা যাচ্ছে। তারপর বিশেষ রসায়নের তৈরী ডাইস্‌ বা ছাঁচ ইচ্ছামত মাপে

প্রস্তুত করে ছাঁচে ফেলে নরম দেহকে বাঞ্ছিত আকার দান করে প্রতিটি টিস্যুকে আবার পূর্ণবয়স্ক মানুষের টিস্যুর মত করেই দিলেই হলো।"

—"আশ্চর্য!" বল্‌লো আরতি ও অনিমেষ। "কিন্তু এ আবিষ্কার জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করবে! তোদের খুশীর খেয়ালে আজ যদি স্বষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, সেক্‌স্‌পীয়র, ও অপরাপর মনীষীর, তখন উপায়?"

—"এটা ঠিকই যে অত্যন্ত সহজ উপায়ে তা আমরা সৃষ্টি করতে পারি!" বল্‌লো কল্যাণ।

"কিন্তু জেনে রাখিস্‌ যে আমিই সর্বেসর্বা নই, আমার প্রতিটি কাজের জন্য অনুমতি নিতে হয় নির্দেশকের কাছে। জগতের হিতসাধন ছাড়া অন্যায় বা ক্ষতিকর কিছু করলে নির্দেশকের কোপে পড়তেই হবে যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ!" অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম—যেমন ধর, কুকুরকে ছোট ঘোড়া গাধাকে শুয়োর আর বেড়ালকে খরগোসের মত বানিয়েছিলাম। একবার বাঘ ধরে পরীক্ষা করেছিলাম—গরুর মত চেহারা করে দিলে ওদের হিংস্র স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় কিনা। এই দেখো আমার কয়েকটি "হাঁসজারু" ও "জিরাফড়িং" জাতীয় প্রাণীর ফটোগ্রাফ।" কল্যাণ অ্যাল্‌বাম মেলে ধরলো।

—"এতো দেখছি সুবিখ্যাত রস-স্রষ্টা সুকুমার রায়ের কল্পনাকে সার্থক করে তুলেছিস্‌! কিন্তু কেমন করে এসব আবিষ্কার সম্ভব হলো?"

—"সে এক আশ্চর্য ইতিহাস।" কল্যাণ বল্‌তে সুরু করলো।

—"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। তখন আমি জীবাণুর আলোক বিকীরণের (ফ্লোরেস্‌সেন্স) ওপর রিসার্চ করছি। আমার তখন প্রয়োজন ছিল ২২০০ থেকে ৬০০০ অ্যাংষ্ট্রম্‌ ওয়েভ লেংথের স্পেক্‌ট্রাম রেঞ্জ এবং সেই অনুসারে থোরিরাম ল্যাম্পকে আল্‌ট্রা ভায়োলেটের

উৎস হিসেবে কাজে লাগাচ্ছিলাম। এই থোরিয়াম ল্যাম্পে নীল ও বেগুনীর মাঝামাঝি বর্ণালী পাওয়া যায় যা জীবাণু আক্রান্ত কোষের ওপর খুবই কার্যকরী বলে মনে হচ্ছিল আমার। যে থোরিয়ামের চাকৃতিটিকে ক্যাথোড্ রে দিয়ে বোম্বার্ড করা হয় প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য (ভ্যাকুয়াম) টিউবের মধ্যে সেই চাকৃতিটি সামান্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবার ফলে ঠিকমত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল না ল্যাম্প থেকে। তাই ওটা সারাচ্ছিলাম।

"আমার পাশেই বসে কাজ করছিল ইংরেজ বন্ধু হেন্‌রী। ক্যাথোড রে টিউবের ওপর। সে তখন দশ মিলিমিটার প্রেসারে অ্যানোডের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসা গোলাপী রঙের পজিটিভ্ কলাম্ ও ফ্যারাডের ডার্ক স্পেশ-এর এক্সপেরিমেণ্ট করছিল। একটা উজ্জ্বল নীল বিন্দু ক্যাথোডের দিকে ফুটে উঠেছিল। যথারীতি মেরামতের পর সুইচটা অন্ করে দিয়েই বুঝলাম যে আমার কাজ ঠিকমত হয় নি এবং সম্পূর্ণ অজানা এক রশ্মি বেরিয়ে এলো ল্যাম্পটা থেকে। সুইচ্ বন্ধ করে দেবো ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের চম্‌কে দিয়ে সাম্‌নে আবির্ভাব হলো এক আধোছায়া আধো কায়াময় মূর্তির—"আমি ইউরেনাস থেকে এলাম এইমাত্র। বহুদিন থেকেই বিভিন্ন গ্রহে আলোক সংকেত পাঠাচ্ছিলাম আমরা। এই সর্বপ্রথম সে সংকেতের অর্থ বুঝে আলোক সংকেতে জবাব জানালে তোমরা। তোমাদের আহ্বানে আমি এসেছি, বলো কি জান্‌তে চাও।"

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমাদের আলোকরশ্মি নিয়ে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একী অভাবনীয় যোগাযোগ!! আমি উঠে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি এমন সময় হেন্‌রী এক কাণ্ড করে বস্‌লো! বড়ো জন্তু ধরে রাখার লোহার খাঁচাটা যান্ত্রিক কৌশলে উঠিয়ে আগন্তুককে চাপা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার ফল হলো সাংঘাতিক! ধূলোর মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে লীন হয়ে গেল খাঁচা সমেত হেনরীর দেহটা। ও বল্‌লে—"আমাকে ধরা যাবে না,

এ অসম্ভব চেষ্টা আর করতে যেও না। আমার দেহ তোমাদের মত উপাদানে তৈরী নয়—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা চিন্তা করতে পারো? যা কঠিন, তরল, বায়বীয় কোনটাই নয়? তেমন জিনিষকে ধরে রাখবে কি দিয়ে? তোমার ঘর চারদিকেই বন্ধ। তবু তার মধ্যে কেমন করে এলাম সে কথা ভেবেছো? মূর্খ! তা'র চাইতে আত্মসমর্পণ করো, শিষ্যত্ব গ্রহণ করো আমার। তাহলে তোমায় শেষ করে ফেল্‌বো না, গবেষণা কাকে বলে তা শেখাবো। আমরা বিনীত যারা তাঁদের শাস্তি দেই না, বিভিন্ন গ্রহের প্রাণীদের বিজ্ঞান সাধনায় সাহায্য দানে আমরা আগ্রহী। তোমরা পৃথিবীর প্রাণীরা অত্যন্ত প্রাচীন এক পশ্চাৎপদ যুগে পড়ে আছো—অনেক কিছু শেখার বাকী আছে তোমাদের। কি, ইন্‌টারেষ্ট্ আছে?"

সারেণ্ডার করলাম। না করলে হেন্‌রীর মতই পরিণতি হবে আমার। ইউরেনাসের প্রাণীটি এগিয়ে এসে হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালো।

—"হেন্‌রীকে হারিয়ে খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করছি"···দুঃখেরসঙ্গে জানলাম।

—"তবুও ওকে এখন বাঁচিয়ে দেবো না।" বল্‌লো ইউরেনাস্‌-বাসী। "ওর দেহ এখন পরমাণুর চাইতে লক্ষগুণে ছোট হয়ে আকাশে ছড়িয়ে গেছে। কণাগুলিকে একত্রিত করে ওকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, কিন্তু ওর ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছি আমি।"

হেন্‌রী আর ফিরলো না। সেদিন থেকে আগন্তুক আমার গুরু, আমার বিজ্ঞান জগতের দিগদর্শক, আমার মন্ত্রণাদাতা, বিপদে আপদে ত্রাণকর্ত্তা। তোমাদের জন্যে যা কিছু করেছি, যা কিছু তোমাদের অলৌকিক মনে হয়েছে সবই ঐ গুরুর নির্দেশে। যাক্। কথায় কথায় অনেক সময় অতিবাহিত হলো। এখন চলো, যে ঘরে তোমাদের নিশিযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে সেটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। লিলি আর অনিতা অনেক যত্নে সাজিয়েছে তোমাদের ফুলশয্যা।"

—"কিন্তু কোথায় তোমার গুরু? আমরা কি তাঁকে একবার দেখতে পারি না?"—প্রশ্ন করলো অনিমেষ।

—"কিছুতেই নয় বন্ধু। ওরই নির্দেশে আমি শুধু ওর অস্তিত্বের কথাটাই তোদের জানালাম। তবে অনুরোধ রইলো, কক্ষণো কারো কাছে প্রকাশ করবি না একথা। করলে সকলের মৃত্যু অবধারিত। অন্যায়ের কোনো ক্ষমা নেই ওর কাছে।"

—"ঠিক আছে বন্ধু। যে উপকার আমরা তাঁর অনুগ্রহে পেলাম, তা' মুখে বলার নয়। তাই যে কৌতূহলের প্রশ্রয় নেই তাঁর কাছে তা' মনেও স্থান দিতে চাই না। তবে তোর সাথে দেখা হলে বলিস্, আমরা দুজনে তাঁর উদ্দেশ্যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম।"

আরতির হাত ধরে কল্যাণকে অনুসরণ করে চলা শুরু করলো অনিমেষ।

রকেট বই বেরুলো ঃ

কুমেরুর বিভীষিকা

রণেন ঘোষ

দাম দু টাকা

তিনরঙা রোমাঞ্চকর প্রচ্ছদে মোড়া রুদ্ধশ্বাসী বিজ্ঞানসুবাসিত উপন্যাস

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪। ফোন ঃ ৩৪-৭২৭৪

নির্জলা বিজ্ঞান

আমেরিকার পার্লফিশ নামক একরকম ছোট মাছের চাষ করা হচ্ছে মশার বংশ ধ্বংস করার জন্যে। মশার বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থানে এই মাছ ছেড়ে দিলেই মাছগুলো মশকের লার্ভা খেয়ে ফেলবে।

•

আমেরিকায় পরমাণুর সাহায্যে খাদ্যশস্য অনির্দিষ্টকাল গুদামজাত রাখার চেষ্টা চলছে। ফলে, পোকামাকড় তা ধ্বংস করবে না, পচবেও না। কোবাল্ট—৬০ তেজোবিকিরণ যন্ত্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিয়ে খাদ্যদ্রব্য শোধন করা হবে।

•

আমেরিকার গবেষকরা এক 'অত্যাশ্চর্য তন্তু' উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে নোনা ও দূষিত জলকে সুপেয় জলে পরিণত করা সম্ভব হবে কম খরচে। কৃত্রিম তন্তুগুলি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম ফাঁপা নল বিশেষ। জলপরিষ্কারক যন্ত্রটির মধ্যে এরকম ২ কোটি নল থাকবে।

•

আমেরিকার মেরিনার-৩ ও মেরিনার-৪ উপগ্রহদুটি মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করেছে। এবার শুক্রগ্রহের দিকে যাচ্ছে 'মেরিনার ভেনাস ১৯৬৭'। শুক্রগ্রহের অন্ধকার ঢাকা অংশের ২০০০ মাইলের কাছাকাছি যাবে এই উপগ্রহ। আমেরিকা চাইছে ১৯৭০ সালেই স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানকে শুক্রগ্রহে নামিয়ে দিতে।

•

আমেরিকার অরবিটার-৪ উপগ্রহটি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে অটোমেটিক ক্যামেরায় চাঁদের ৩২৬ টি ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি ছবি দূরবীণে তোলা ছবির চেয়ে একশগুণ বেশী স্পষ্ট।

•

খাদ্য হিসেবে তুলাবীজ তৈল ব্যবহার করা যায় কিনা, এসম্পর্কে গবেষণার জন্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্তরাষ্ট্র সরকার টাকা দিয়ে সাহায্য করছে।

•

মাঝের গুঁড়ার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যপ্রস্তুত তৈরীর কারখানা পত্তনের আয়োজন চলছে আমেরিকায়। এ কারখানায় ২৪ ঘণ্টায় ৫০ টন মাছের গুঁড়া তৈরী হবে।

•

পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি নানা খনিজ পদার্থ ও ভেষজদ্রব্য এবং বহু রকমের মাছ সমুদ্রে রয়েছে। এই সব প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধানে আমেরিকার ওশানো-গ্র্যাফার নামে একটা বিরাট জাহাজ বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছে। জাহাজটির পেছনে ৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। জাহাজটি বোম্বাইতেও এসেছিল।

•

গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করে আসছেন যে মানুষের বংশধররা তাদের পিতামাতার চেয়ে ক্রমশই মাথায় লম্বা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীতে এই সব ঢ্যাঙা ছেলেরা 'টল ক্লাব' গড়েছে।

•

প্রায় ৪০ বছর আগে বিমান জগতে সী-প্লেন বা জলবিমান একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জেটযুগে সী-প্লেন তার প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেনি। অথচ বিশেষজ্ঞরা ইদানীং বলছেন সমুদ্রে জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের কাজে অন্য কোন বিমান সী-প্লেনের সমকক্ষ নয়। পশ্চিম জার্মানীতে তাই এই বিমান আবার তৈরী হচ্ছে।

•

পশ্চিম জার্মানীর এক মনোবিকার বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পাকস্থলীর আলসার, স্থূলত্ব, বাত, হাঁপানী প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রোগসমূহের কারণ সাধারণত মানসিক চাঞ্চল্য।

•

খনি থেকে কয়লা তোলার জন্যে পশ্চিম-জার্মানী যে নতুন ড্রেজার বানিয়েছে সেটা একটা অতিকায় দৈত্যবিশেষ। ইস্পাতের এই দৈত্য ২০ ঘণ্টায় ১,১০,০০০ টন কয়লা কেটে খনির মুখে জড়ো করতে পারে। এই পরিমাণ কয়লা চালান দিতে তিরিশ মাইল লম্বা মালগাড়ী দরকার।

০

চারদিকে জলঘেরা জমিকে আমরা বলি দ্বীপ, কিন্তু "জলের মধ্যে দ্বীপ" আবার কাকে বলে? পৃথিবীর সমুদ্রগুলির নীচে এরকম ২০,০০০ দ্বীপ আছে যার মধ্যে বিজ্ঞানীরা ১২০০ দ্বীপের সন্ধান পেয়েছেন। জলের নীচে এইসব দ্বীপের উৎপত্তি রহস্যে ঘেরা, তবে সম্ভবতঃ এগুলি আগ্নেয়গিরির চূড়া।

জলের নীচে এইরকম আরও দ্বীপ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জার্মান গবেষণা জাহাজ মিটিয়র অভিযানে বেরিয়েছে।

০

পশ্চিম জার্মানীর এক যুবক ছাতের চিলেকোঠায় যন্ত্রপাতি বসিয়ে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করছে। সাহায্য পাচ্ছে আমেরিকা আর রাশিয়ার কাছ থেকে।

•

জার্মানীর দুজন শিক্ষাবিদ এক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। জানা গেছে যে নয়-দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা জীবজন্তু, রূপকথা, রোমাঞ্চকাহিনী ও বিজ্ঞাপন দেখতে ভালোবাসে, এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের পছন্দ মারামারি, ভূতুড়ে কাহিনী, সরস রোমাঞ্চ ও বুদ্ধির কৌশল। তেরো থেকে পনের বছরে ছেলে-মেয়েরা পছন্দ করে খেলা, নাটক ও জনপ্রিয় গান আরও যারা বড় তাদের আকর্ষণ হ'ল রাজনীতি, সংবাদ ঘটনাপ্রবাহ ও আলোচনা। কিন্তু টেলিভিশন এই ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে।

*

সাধারণের ধারণা ছিল যে মদের নেশা কফিতে ছোটানো যায়। ইঁদুর এবং মানুষের ওপর পরীক্ষা কোরে মিউনিখের এক মনোবিজ্ঞানী সে ধারণা ভুল প্রতিপন্ন কোরেছেন। কফি যে মদের নেশা ছাড়াতে পারে না তা নয়, মাতালকে আরও দুর্বল করে। কফি শুধু সুস্থ মানুষকে চাঙ্গা কোরে তুলতে পারে কিন্তু দেহ যদি ক্লান্ত হয়, কফি তাকে আরও অবসন্ন করে।

*

এবার বোধহয় ক্যানসার চিকিৎসার একটা সুরাহা হতে চলেছে। হাইডেল-বেরগের বিজ্ঞানীরা এমন একটি পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন যেটি শরীরের সুস্থ কোষগুলিকে ধ্বংস করে। এই পদার্থ টির নাম "পিউরিলহিস্টামিন"।

ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে জার্মান জীববিজ্ঞানীরা এক নতুন জাতের

"লিপাইন" গাছের চাষ করেছেন যার মধ্যে মানুষের পুষ্টিকারক প্রোটিন আছে। এ গাছ আগে পশু খাদ্য ছিল।

*

জার্মানী বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ঘন ঘন এক্স-রে'র প্রভাবে দেহ কোষের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সে প্রভাব ২০০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

*

বিবিধ

শহরের ওপর খুব নিচু দিয়ে উড়ন্ত জেট বিমানের কানফাটা শব্দে উত্যক্ত হয়ে, মিউনিখের এক কমার্শিয়াল আর্টিস্ট এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। সে তার গুলতির সাহায্যে বিমানের দিকে গরম আলুর গোলা ছুঁড়তে শুরু করে, আর তাতেই যথেষ্ট ফল হয়েছে। বিমানগুলি এখন ৫০ মিটার ছেড়ে ৫০০ মিটার উঁচু দিয়ে উড়তে শুরু করেছে।

*

পশ্চিম জার্মানীতে টাইপিস্টদের অভাব হয়েছে। তাই চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়দের আবার ঘর সংসার থেকে টেনে আনার চেষ্টা চলছে।

*

একটি জার্মান প্রদর্শনীতে দেখা গেছে সেকেলে ঢঙের বাড়ীগুলির সঙ্গে হ্যালফ্যাশানের বাড়ীগুলি মিলে যাচ্ছে।

*

২৮১ বছরের পুরোনো তিন বোতল মদ শীগগিরই লণ্ডনে নীলামে বিক্রি হবে।

সায়ান্স-ফিক্‌শ্যন সিনে ক্লাবের টুকরো খবর

একটি চিঠি : জুন ১০, ১৯৬৭

সম্পাদক, সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

'আশ্চর্য' জুন সংখ্যায় সংবাদটি পড়ে নিদারুণ মর্মাহত হয়েছি। শুনলাম গত ১৪ই মে-র লজ্জাকর ঘটনার সংবাদ। আমাদের ক্লাব ও তার সদস্যদের সম্পর্কে আমার খুব উঁচু ধারণা আছে। সেটা একটু আহত হয়েছে। আজ এই ঘটনা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে বেশ কিছু ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—আমি সে দিনের উৎশৃঙ্খল সদস্যদের এই নামেই ডাকছি—তাঁরা উৎশৃঙ্খল, তাঁরা S. F. প্রেমী নন। কারণ S. F. আর যাই শেখাক উৎশৃঙ্খলতা কদাপি শেখায় না।

প্রথম ব্যাচে ছবিটা দেখেছিলাম—তাই সে দিনের উৎশৃঙ্খলতাকে চাক্ষুষ দেখতে হয়নি (এবং তার জন্য ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ!), কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি না সদস্যরা কেন হল্লাবাজির পথ বেছে নিলেন। ত্রুটি একটু আধটু তো থাকবেই—সেটাকে সহ্য করার বা মেনে নেওয়ার মানসিকতা কি S. F. তাদের মধ্যে প্রস্তুত করতে পারে নি? (প্রসঙ্গতঃ S. F.এর উদ্দেশ্য স্মরণীয়) এখন ভয় হচ্ছে এই মহাপুরুষরা আবার ২রা জুলাই কিছু না করে বসেন! না আঁচালে বিশ্বাস নেই মশাই!

একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ছে। আমাদের ক্লাবে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁরা S. F. সম্পর্কে যারপরনাই অজ্ঞ। এদের পরিচয় আংশিকভাবে পেয়েছিলাম ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায়। কিন্তু কি করা যায়? এরা একটা যে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এটাই এখন বাস্তব সত্য। এদের তো অস্বীকার করা যায় না।

আমি একটা প্রস্তাব করছি। ভেবে দেখতে পারেন। প্রস্তাবটা আর কিছুই নয়—সদস্যদের সাথে কর্তৃপক্ষের আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গড়ে তোলার। শুনে-

ছিলাম পরলোকগত ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী ক্লাব সদস্যদের নিয়ে S. F. বিষয়ে একটা Symposium করার প্রস্তাব করেছিলেন। শুনে খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। এরকম Symposium সদস্যদের S. F. Appreciation তো জাগাবেই—উপরন্তু অনেক আনন্দের খোরাক পাওয়া যাবে।

আমার মনে হয় আপনারা যদি এরকম কিছু একটা করেন ও ক্লাব সদস্যদের নিয়ে জমায়েত হন, একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর এক ঢিলে দুই পাখিও মারা যাবে। আর শান্তি পাবে ডঃ রায়চৌধুরীর পরলোকগত আত্মা। নমস্কারান্তে দেবপ্রিয় গুহ রায় (1201)

*

পূর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও "মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড" ছবিটি দেখানো গেল না প্রিণ্টের অভাবে। তিনটি প্রিণ্টের দুটি ছিল কলকাতায়, একটি মাদ্রাজে। কিন্তু তিনটেই এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, পরিবেশক যথাসময়ে নিজেরাই জানিয়ে দিলে ফিল্মের অবস্থা। অগত্যা চেক দূতবাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত 'দি ক্রিয়েশন অভ দি ওয়ার্ল্ড' ছবিটি প্রদর্শনের আয়োজন হল। সেই সঙ্গে ছোট্ট রঙীন ফিল্ম 'ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড' অভ ক্যারেল জেমান' ফিল্মটি চেক কনশুলেট-জেনারেল দিতে রাজী হন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছোট ফিল্মটি রাঁচী থেকে আনানো সম্ভব না হওয়ায় তার পরিবর্তে দেখানো হয় কার্টুন ফ্যানটাসি শর্ট ফিল্ম "দি ম্যাজিশিয়ান"।

*

"দি ক্রিয়েশন অভ দি ওয়ার্ল্ড" ফিল্মটি বহু পুরস্কার বিজয়ী। ১৯৫৮ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করে। তারপরেই, ঐ একই বছরে, ভেনিসে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্র্যাণ্ড প্রিক্স এবং জুরীর স্পেশাল প্রাইজ লাভ করে।

*

গত রবিবার দোসরা জুলাই অ্যাকাডেমি অভ ফাইন আর্টস্ প্রেক্ষাগৃহে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অতুলনীয় এই কার্টুন ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। বাইবেলের প্রারম্ভিক 'জেনেসীস' অধ্যায়ে পৃথিবী সৃষ্টির যে উপাখ্যান আছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষভাবে রঙীন কার্টুন ফিল্মে তার অপূর্ব রূপায়ণ দর্শক-সদস্য ও অভ্যাগতদের মুগ্ধ করে। 'ক্রিয়েশন অভ দি ওয়ার্ল্ড'-এর আগে দেখানো হয় কল্পনাকৌতুকাবহ ফ্যানটাসি কার্টুন 'দি ম্যাজিশিয়ান'।

ক্লাবের বিগত দেড় বছরের অনুষ্ঠানধারার মধ্যে গত রবিবারের ফিল্ম প্রদর্শনীটি —এক অতুলনীয় অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে এনেছে, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে, গত রবিবার ক্লাবটিতে "ক্রিয়েশন অভ দি ওয়ার্ল্ড" ফিল্মটি দেখানোর পরে ক্লাবের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচীতেই আছে "ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস"—আগামী ১৫ই আগস্ট লাইট হাউস সিনেমায়।

ফিল্ম্ ক্লাব উৎসাহীদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ক্লাবটিতে নতুন সদস্যের আবেদন পত্র নেওয়া বন্ধ থাকবে।

*

রবিবারের প্রদর্শনীতে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাজির হয়েছিলেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে। বিভিন্ন দূতাবাস থেকেও অনেকে এসেছিলেন বিখ্যাত এই চেক কার্টুনটি দেখতে। "বালিকা বধূর" নায়ক কিশোর পার্থ এসেছিলেন তাঁর দাদা সৌমেনকে নিয়ে।

সম্প্রতি "নিশিকুটুম্ব"র জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী মনোজ বসু ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন পৃথিবী সৃষ্টির কার্টুন ফিচার ফিল্মটির। এসেছিলেন কবি সুনীল বসু, কার্টুনিস্ট হিমানীশ গোস্বামী ও কুমার অজিত।

*

ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন সস্ত্রীক চারুপ্রকাশ ঘোষ, প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী। ক্লাব প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ রায় হলিউড থেকে ফিরে ছিলেন মাত্র তিনদিন আগে। কাজেই নানারকম কাজের চাপে তাঁর নিঃশ্বেস ফেলবার ফুরসৎ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে এসে-ছিলেন বহু আলোচিত এই ছবিটি দেখতে। সঙ্গে এসেছিল তাঁর একমাত্র পুত্র খোকন। যাবার সময়ে সে একখানা "গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ" পকেট বই পকেটস্থ করে নিয়ে গেল। কেন না, সামনের বারেই লাইট হাউসে দেখানো হচ্ছে "গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ" অর্থাৎ ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ডস।

*

স্টেটসম্যানের বিদেশী ফিল্ম্ সমালোচক শ্রীমতী দস্তুর এসে বসেছিলেন সত্যজিৎবাবুর ঠিক পেছনে। ছবিটি যে তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের দিন ভোরে স্টেটসম্যানের পাতা ওলটাতেই। সবার আগে চোখে পড়ে এমনি একটি জায়গায় "কার্টুনড জেনিসীস" শিরোনামা দিয়ে কেবল প্রশংসাই করেছেন।

*

আপনার লেখক-লেখিকা হওয়ার

বিরাট সম্ভাবনা আছে !

অর্থ উপার্জ্জনের একটি পথ খোলা আছে !

লিখতে পারেন ? তাহলে সামান্য চেষ্টা করলেই আপনার লেখা গল্প প্রবন্ধ প্রকাশের উপযোগী করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হতে পারে। আপনার অবসর সময়ের খেয়ালে লেখা গল্প প্রবন্ধ থেকে অর্থ উপার্জনও হতে পারে।

পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা ভালো লেখা খুঁজছেন। আপনার লেখা ঠিকমতো সংশোধন করে সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁদের হাতে পৌঁছনো দরকার। এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

Director

INDIAN LITERARY AGENCY

Box 677

C/o SUKHI MON

97-1, SERPENTINE LANE, CALCUTTA-14

Phone : 34 4696

জবাবের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ লেখা পাঠান এখুনি।

Rged. C-118 ASCHORJO ! July-August 1967 Re. 1-50

মন সম্পর্কে একমাত্র সর্ব জনপ্রিয় মাসিক

সুখীমন

সগৌরবে তৃতীয় বর্ষ চলছে

ভেতরে পুরু ধবধবে সাদা কাগজে ছাপা হচ্ছে, দুরঙা আর্ট মলাটে প্রতি মাসে নতুন নতুন মনোরম তৃপ্তিদায়ক ফোটো ছাপা হচ্ছে—যত্ন করে রাখার মতো, পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়েছে—অর্থাৎ মাসভর পড়বার মতো লেখাও বেড়েছে, ভাগ্য পরীক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে, ভালো ভালো লেখা বেরুচ্ছে, মন নিয়ে মিষ্টিমধুর গল্পও থাকছে !

জুলাই সংখ্যায় আছে :

নাস্তির একটি দুপুর (গল্প)
বদ্ অভ্যাস দূর করার উপায়
মা সব সময়ে ঠিক করেন না
আপনি কি চাকরিতে উন্নতি করতে চান ?
ব্রনর দাগ
বিধবারা কি নিয়ে বাঁচবেন ?
কৈশোর প্রেম
কি আছে আপনার ভাগ্যে ?

প্রতিটি লেখা সচিত্র— দাম মাত্র ৫০ পয়সা
গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫৲, ষান্মাসিক ২·৫০

সম্পাদক :
অসীম বর্ধন, এম্ এড, এম্ এ

অ্যাল্ফা-বিটা পাবলিকেশনস্, ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা ১৪
ফোন ৩৪-৭২৭৪